উন্নয়নের পাঁচ বছর

(২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)

অর্থ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা

অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.mof.gov.bd

উন্নয়নের পাঁচ বছর

(২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)

অর্থ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা

অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.mof.gov.bd

মুখবন্ধ

'রূপকল্প ২০২১'এ বৈষম্যহীন দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের যে স্বপ্ন রচনা করা হয়েছে তার প্রধান রূপকার হিসেবে বিগত সাড়ে চার বছরে অর্থ মন্ত্রণালয়াধীন প্রতিটি বিভাগের কর্মপ্রচেষ্টা ছিল ঐকান্তিক ও নিরলস। বিশেষ করে ২০০৭ থেকে শুরু হওয়া বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ছিল এ সময়ে দেশের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আর এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অর্থ মন্ত্রণালয় পালন করেছে অনবদ্য ভূমিকা। আমরা এই প্রকাশনায় ৫ বছরের কথা বলেছি। কিন্তু যেসব তথ্যের উপর এই প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে তা হলো মূলতঃ সাড়ে চার বছরের। তবে আরও ১ বছরের জন্য জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৪ পর্যন্ত আমরা অর্থনীতির একটি প্রক্ষেপণ করেছি আমাদের বাজেটের মধ্য দিয়ে। আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে সাড়ে ৪ বছর নানা অনিশ্চয়তা এবং প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও মোটামুটিভাবে দেশে শান্তি বিরাজ করে এবং আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা কৌশল বিশেষভাবে সাফল্যমন্ডিত হয়। বর্তমানে কিন্তু শান্তি ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। সহিংস রাজনৈতিক প্রতিবাদ দেশের বিভিন্ন জায়গায় জীবন ও সম্পদের অনেক ক্ষতিসাধন করছে। অর্থনীতির জন্য এই রকম সংকট, বিশেষ করে দিনের পর দিন অবরোধ, খুবই নেতিবাচক। এতে সারাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে থাকে। শুধু ব্যতিক্রম এক হিসাবে বলতে গেলে হলো কৃষিখাত। সেখানেও কিন্তু পরিবহন সমস্যা বাধা সৃষ্টি করতে সক্ষম। সারাদেশে জনজীবনে যে অবক্ষয় শুরু হয়েছে তা অতি সত্বর বন্ধ করতে হবে এবং প্রতিবাদের নামে সন্ত্রাসকে শক্ত হাতে দমন করতে হবে।

সামষ্টিক অর্থনীতির বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ,রাজস্ব মুদ্রা ও বিনিময় হার নীতির যথাযথ সমন্বয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ ও সহজশর্তের বৈদেশিক ঋণ ও বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তি, আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুবিবেচনাপ্রসূত ও বাস্তবানুগ নীতি ও সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলার গুরুদায়িত্বটি অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পাদন করেছে দক্ষতার সাথে। এছাড়া, রাষ্ট্রের মৌলিক নীতি কৌশলসমূহের আলোকে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় জাতীয় বাজেট প্রণয়ন,সম্পদবণ্টন প্রক্রিয়াকে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের কর্মকৃতির সাথে সম্পৃক্তকরণ এবং বাজেট বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া অনেকখানি শক্তিশালী করা হয়েছে। বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব প্রদানে দায়বদ্ধতা, জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা অর্জনের লক্ষ্যে আইনী ও বিধিগত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। প্রতিটি মন্ত্রণালয় বিভাগে বাজেট অনুবিভাগ/শাখা খোলা হয়েছে। ৫টি মন্ত্রণালয়ে মধ্যমেয়াদি কৌশলগত কর্ম পরিকল্পনা তৈরির কাজ চলছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাস্তবায়ন পরিস্থিতির নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্ত সর্বাধিক ব্যয়সাপেক্ষ ৫০টি প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে। কর-বহির্ভূত রাজস্বের হারসমূহ যৌক্তিকীকরণ এবং একে চলতি বাজার মূল্যের সাথে সমন্বয়ের কাজ চলমান আছে। কর প্রশাসনের আধুনিকায়ন ও করদাতা বান্ধব পরিবেশ সৃজনের লক্ষ্যে প্রশাসনিক, বিধি ও কাঠামোগত ব্যাপক সংস্কার করা হচ্ছে। ফলে কর রাজস্ব আহরণ জোরদার হয়েছে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রক ও সহায়ক তিনটি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংক, সিকিউরিটিজ এন্ড একচেঞ্জ কমিশন এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ স্ব স্ব ক্ষেত্রে কর্মদক্ষতা ও পর্যবেক্ষণ শক্তিশালী করে আর্থিক খাতকে একটি স্থিতিশীল ও উন্নত অবস্থানে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

বর্তমান প্রকাশনায় বিগত সাড়ে চার বছরে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের বিভাগভিত্তিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এই প্রকাশনার ক্ষুদ্র পরিসরে অর্থমন্ত্রণালয়ের ব্যাপক কর্মকাণ্ডের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা সম্ভব না হলেও এটি বিগত পাঁচ বছরে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ডের একটি অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদানে সহায়ক হবে। অর্থ মন্ত্রণালয়াধীন বিভাগসমূহ স্ব স্ব বিভাগের কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করে প্রকাশনাকে সমৃদ্ধ করেছে। তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। তথ্য সংকলন, সম্পাদনা ও প্রকাশনার শ্রমসাধ্য কাজটি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সম্পাদন করেছে অর্থ বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ। তাদের জন্য রইল আমার অভিনন্দন। প্রত্যাশা করছি প্রকাশনাটি গবেষক, ছাত্র শিক্ষকসহ সর্বসাধারণের কাছে সমাদৃত হবে।

(আবুল মাল আবদুল মুহিত) ১৮ ডিসেম্বর ২০১৩
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

ক্রমিক নং		বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	উন্নয়নের পাঁচ বছর		১
	অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিগত পাঁচ বছরের কার্যক্রমের বিভাগভিত্তিক বিবরণ		৮
১.০	অর্থবিভাগ		৯
	১.১	বিগত পাঁচ বছরের কার্যক্রম	৯
	১.১.১	বাজেট প্রণয়ন, সম্পদ বন্টন ও ব্যয় ব্যবস্থাপনা	৯
		মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় বাজেট প্রণয়ন	৯
		সম্পদ বন্টন	৯
		সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা	৯
		ঘাটতি অর্থায়ন	১০
		আইনগত সংস্কার	১০
	১.১.২	বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলা ও অব্যাহত প্রবৃদ্ধি অর্জন	১১
		বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার অভিঘাত মোকাবেলা	১১
		অভ্যন্তরীণ চাহিদার গতি সচল রাখা	১২
		বিদ্যুৎ সংকটের মোকাবেলা করে চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ বৃদ্ধি ও জ্বালানি বহুমুখীকরণ	১৩
		কর্মসংস্থান	১৪
		মানব উন্নয়ন	১৪
		অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণে গতিশীলতা আনয়ন	১৫
		সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি	১৫
		মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ	১৫
২.০	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ		১৬
	২.১	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংস্কারমূলক কার্যক্রম	১৬
		আইন ও বিধি সংস্কার	১৬
		জনবলের পুনর্বিন্যাস	১৭
		শুল্ক ও কর কাঠামোর সংস্কার	১৭
		শুল্ক বিভাগের সংস্কার	১৮
		সমন্বিত অটোমেশনের মাধ্যমে আধুনিকায়নের প্রয়াস	১৮
		সার্বিক সংস্কার ও আধুনিকায়ন কার্যক্রম	১৮
	২.২	রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি	১৯
		জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব আদায়	১৯
		সার্বিক রাজস্ব আদায়	২০
		কর আরোপ ও আদায় পরিবেশ	২০
	২.৩	জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তরের সংস্কারমূলক কার্যক্রম	২০

ক্রমিক নং		বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৩.০		**ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ**	**২৩**
	৩.১	ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্পর্কিত	২৩
		আইনী সংস্কার	২৩
		অটোমেশন	২৩
		জনবল ব্যবস্থাপনা	২৩
		অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি সহায়ক কার্যক্রম	২৪
	৩.২	ব্যাংকিং খাত সম্পর্কিত কতিপয় নির্দেশকের হালনাগাদ পরিসংখ্যান ও তথ্য	২৪
	৩.৩	ব্যাংকিং খাতের ঋণের মোট আগাম ও সেক্টরভিত্তিক বিভাজন	২৫
	৩.৪	আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবসায় এবং বিশেষ কার্যক্রম	২৬
	৩.৫	ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম	২৬
	৩.৬	বীমা সম্পর্কিত	২৭
		আইনী সংস্কার	২৭
		ব্যবস্থাপনাগত সংস্কার	২৭
		জনবল	২৮
	৩.৭	পুঁজিবাজার সংক্রান্ত	২৮
		পুঁজিবাজার পরিস্থিতি	২৮
		পুঁজি সরবরাহ	২৯
		দন্ড ও জরিমানা	২৯
		স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি	২৯
		সংস্কার কার্যক্রম	২৯
৪.০		**অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ**	**৩১**
	৪.১	যৌথ সহযোগিতা কৌশলপত্র প্রণয়ন	৩১
	৪.২	বৈদেশিক সহায়তা	৩২
		বৈদেশিক সাহায্য ছাড়করণ	৩২
		বৈদেশিক সাহায্য সংগ্রহ	৩২
	৪.৩	বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনা	৩৩
		বৈদেশিক সহায়তার খাত	৩৩
		ঋণের প্রকৃতি ও স্থিতি	৩৪
		ঋণ পরিশোধ	৩৪
		ঋণ ধারণক্ষমতা	৩৫
	৪.৪	এনজিও কর্তৃক প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্য	৩৬

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
চিত্র তালিকা		
চিত্র ১	জিডিপি প্রবৃদ্ধির খাতভিত্তিক অবদান	১২
চিত্র ২	ছাড়কৃত বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে অনুদান ও ঋণের হার	৩২
চিত্র ৩	উৎস অনুযায়ী কমিটমেন্টের হার	৩৩
চিত্র ৪	ছাড়কৃত বৈদেশিক সহায়তার খাতভিত্তিক পরিমাণ	৩৩
চিত্র ৫	অর্থ বছরের শেষ দিনে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণের স্থিতি	৩৪
চিত্র ৬	বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ	৩৫
	সারণি তালিকা	
সারণি ১	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব আদায়	১৯
সারণি ২	খাতভিত্তিক ঋণ বিভাজন	২৫
সারণি ৩	আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পদ, দায়, আমানত, ঋণ ও ঋণ শ্রেণিকরণ	২৬
সারণি ৪	পাবলিক সেক্টরে বৈদেশিক ঋণের সূচক	৩৫
পরিশিষ্ট		
পরিশিষ্ট ১	খাতভিত্তিক মোট ব্যয়	৩৭
পরিশিষ্ট ২	খাতভিত্তিক উন্নয়ন ব্যয়	৩৮
পরিশিষ্ট ৩	বাজেট ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণি বিন্যাস	৩৯
পরিশিষ্ট ৪	ভর্তুকি ও সাহায্য মঞ্জুরি বাবদ ব্যয়	৪০
পরিশিষ্ট ৫	ব্যয়ভিত্তিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির কাঠামো: খাতভিত্তিক অবদান (%)	৪১
পরিশিষ্ট ৬	বৈদেশিক সাহায্যের অঙ্গীকার ও ডিসবার্সমেন্ট	৪২
পরিশিষ্ট ৭	বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ	৪৩
পরিশিষ্ট ৮	বেসরকারি সাহায্য সংস্থার মাধ্যমে প্রাপ্ত বৈদেশিক সহায়তা	৪৪
পরিশিষ্ট ৯	রাজস্ব আয়	৪৫
পরিশিষ্ট ১০	জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের বিনিয়োগ বিবরণী	৪৬
পরিশিষ্ট ১১	রপ্তানি ও আমদানির বিবরণী	৪৭

উন্নয়নের পাঁচ বছর

'দিন বদলের' অঙ্গীকারের সনদ 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ক্ষমতা গ্রহণের পরই সরকার 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১'ও ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। সে সময়ের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিরাজমান নেতিবাচক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সংশয়বাদীরা একে উচ্চাভিলাষী কল্পনা হিসেবে অভিহিত করলেও বাঙ্গালী জাতির শক্তি-সামর্থ্য এবং সরকারের নেতৃত্বের দৃঢ়তা ও গতিশীলতায় সংশয় দূরীভূত হয়েছে। রূপকল্পের স্বপ্ন পূরণের পথে দেশ এগিয়েছে অনেকদূর। ১৯৭১ এর বিজয়ের ধারাবাহিকতায় ২০০৯-২০১৩ সময়কালের সাফল্যে জাতি আজ অর্থনৈতিক মুক্তিলাভের মাহেন্দ্রক্ষণে উপনীত। এ অগ্রযাত্রায় বিগত পাঁচ বছরে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। আমরা ৫ বছরের প্রতিবেদন দিচ্ছি। যদিও আমাদের তথ্যসমূহ মোটামুটিভাবে সাড়ে ৪ বছরের। ২০১৩ সালের জুন মাসে ২০১৪ অর্থবছরের বাজেট পাস হয়েছে। এবং সেখানে ২০১৪ অর্থবছরে অর্থনীতির একটি প্রক্ষেপণ উপস্থাপন করা হয়েছে। সাড়ে ৪ বছরের ইতিবাচক অর্জন এবং অগ্রগতি আমাদের এই প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে। এমতাবস্থায় পরবর্তী ৬ মাসের প্রক্ষেপণ সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এবং বিশেষ করে বর্তমান সহিংস রাজনৈতিক প্রতিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনীতির উপর এর প্রভাব সম্বন্ধে কিছুটা ইঙ্গিত দেয়া সমীচীন।

গত প্রায় দুই মাসব্যাপী দেশে রাজনৈতিক প্রতিবাদের নামে যে কর্মকাণ্ড হচ্ছে তা দেশের বিভিন্ন জায়গায় ব্যাপকভাবে সম্পদ ধ্বংস করছে এবং জীবনহানি ঘটাচ্ছে। এদেশে ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড এমনি মনে হয় বেশি মাত্রায় বিরাজ করে। এখানে নতুন উপসর্গ হলো জ্বালাও-পোড়াও এর নতুন একটি ট্রাডিশন। হরতাল বা অবরোধ এখন আর রাজনৈতিক প্রতিবাদ নয়, এটা পুরোপুরি সহিংস সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে পর্যবসিত হয়েছে। নির্বাচনী মৌসুমের সুযোগ নিয়ে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এই সময়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নানা ক্ষেত্রে প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। ভয়ভীতি এবং পরিবহনের অসুবিধা সারা অর্থনীতিকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। রাজস্ব আদায় যেমন ব্যাহত হচ্ছে, বৈদেশিক সম্পদের ব্যবহারও তেমনি থমকে গেছে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তো দূরের কথা রুটিনমত বেসরকারি খাতেও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা ব্যাহত হচ্ছে। আমাদের গৌরব হলো যে, গত সাড়ে ৪ বছর আমরা উচ্চহারে প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছি, কৃষি ও গ্রামীণ খাতকে সমৃদ্ধ করেছি, রপ্তানির প্রসার ঘটিয়েছি, দারিদ্র্য ও বৈষম্য নিরসন করেছি এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে অগ্রগতি সাধন করেছি। এইসব ক্ষেত্রেই সহিংস রাজনৈতিক প্রতিবাদ নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। আমাদের আশা হলো যে,

(১) আমাদের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান আমরা সমঝোতার মাধ্যমে করতে পারবো;

(২) সহিংস প্রতিবাদকে সন্ত্রাস হিসেবে চিহ্নিত করে তা নির্মূল করতে পারবো;

(৩) এবং এরই ফসল হিসেবে ২০১৪ অর্থবছরেও বিগত ৫ বছরের সমতুল্য অর্থনৈতিক অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে পারবো।

২০০৯ সালে সরকারের দায়িত্ব গ্রহণকালে বিশ্ব অর্থনীতি আমেরিকা ও ইউরোপে সৃষ্ট ঋণ বিপর্যয়ে মন্দাক্রান্ত ছিল। সে সময়ে উৎপাদন ঘাটতি ও সরবরাহ স্বল্পতার কারণে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। ফলে মূল্যস্ফীতি হয় ঊর্ধ্বমুখী। মন্দার কারণে রপ্তানি বাণিজ্য সংকোচন এবং অভিবাসী আয়ের চরম অধোগতির পূর্বাভাসে বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি হয়ে উঠে সংকটময়। সমসাময়িক সময়ে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রও ছিল বিশৃঙ্খল ও হতাশাজনক। অবকাঠামো, বিশেষ করে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে স্থবিরতা, ব্যবসায়ী-উদ্যোক্তা মহলে বিরাজমান অনিশ্চয়তা, সিডর ও আইলার আঘাতসহ সার্বিক প্রেক্ষাপটে দেশে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত হয়ে পড়ে।

সংকটাপন্ন এ পরিস্থিতিতে সরকার দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোকে সচল রেখে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং রপ্তানিমুখী খাতকে সহায়তার মাধ্যমে বৈশ্বিক মন্দা মোকাবেলার জন্য দু'টি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা ও বাস্তবায়ন করে। একই সাথে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও যোগাযোগসহ উৎপাদনমুখী অবকাঠামো এবং কৃষি ও

গ্রামীণ উন্নয়নে অধিকতর সম্পদ ব্যয় করে। পাশাপাশি টেকসই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় মানব সম্পদ উন্নয়ন খাতেও (শিক্ষা,স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি) বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। সে সাথে দরিদ্র, অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কার্যক্রমের আওতায় সুবিধাভোগীর সংখ্যা ও সহায়তার পরিমাণ বহুলাংশে বাড়ানো হয়। ফলে বাংলাদেশের উচ্চ প্রবৃদ্ধি একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য লাভ করে যা হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি (Inclusive Growth) যার সুফল সমাজের সকল স্তরে বন্টিত হয়েছে।

প্রবৃদ্ধির সুষম বন্টনের প্রভাবে বাংলাদেশে মাথাপিছু দারিদ্র্য ২০০৫ সালের ৪০ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ২০১০ সালে ৩১.৫ শতাংশে এবং চরম দারিদ্র্য ২৫.১ শতাংশে হতে ১৭.৬ শতাংশে নেমে এসেছে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির ধারার ভিত্তিতে প্রক্ষেপিত এক হিসেবে দেখা গিয়েছে যে, ২০১৩ সালে মাথাপিছু দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য যথাক্রমে ২৬.২ ও ১১.৯ শতাংশে নেমে এসেছে। উল্লেখ্য যে, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য ছিল ২০১৫ সালের মধ্যে এই হার ২৯ শতাংশে নামিয়ে আনা। দেখা যাচ্ছে নির্ধারিত সময়ের প্রায় দুই বছর পূর্বেই বাংলাদেশ এমডিজি'র উল্লিখিত লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছে। এই সময়ে দারিদ্র্য হার হ্রাস প্রবণতার একটি অন্যতম সন্তোষজনক বিষয় হচ্ছে ধনী-দরিদ্রের আয়ের অসমতাও কিছুটা কমে আসা। জাতীয় পর্যায়ে ২০০৫ সালে মোট আয়ে দরিদ্রতম শতকরা ৫ ভাগ জনগোষ্ঠীর হিস্যা ছিল শতকরা ০.৭৭ ভাগ যা ২০১০ সালে বেড়ে শতকরা ০.৭৮ ভাগে উন্নীত হয়। এ সময়ের মধ্যে মোট আয়ে সর্বাপেক্ষা দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের অংশ শতকরা ১.৩ ভাগ বাড়াতে পেরেছে। অপরদিকে একই সময়ে সর্বাপেক্ষা ধনী ৫ শতাংশ জনগোষ্ঠীর হিস্যা মোট আয়ের শতকরা ২৬.৯ ভাগ হতে হ্রাস পেয়ে শতকরা ২৪.৬ ভাগ হয়েছে। মোট আয়ে দরিদ্রতম জনগোষ্ঠির হিস্যা বৃদ্ধি এবং সর্বাপেক্ষা ধনী জনগোষ্ঠির আয়ের অংশ কমে যাওয়ার কারণে এই সময়কালে আয় বন্টনে অসমতা কিছুটা দূর হয়েছে। আয় গিনি সূচকও ২০০৫ সালের ০.৪৬৭ হতে কমে ২০১০ সালে ০.৪৫৮ হয়েছে যা আয় বৈষম্য হ্রাসের সাক্ষ্য বহন করছে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন একে অপরের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ বিগত পাঁচ বছরে অনেক দূর এগিয়েছে: বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হার প্রায় শতভাগ। শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সুযোগের সমতা সৃষ্টি হয়েছে। কর্মরত শ্রমশক্তির প্রায় ৩০ শতাংশ মহিলা। স্বাস্থ্যসেবা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে গিয়েছে এবং টিকাদান কর্মসূচি প্রায় সার্বজনীন। নবজাতক (এক বছরের কম বয়সি) শিশু মৃত্যুর হার ও মাতৃ মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে প্রতি হাজারে ৩৫ ও ২.০৯ জনে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল বেড়ে ৬৯.২ বছরে উন্নীত হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস, উন্নত স্যানিটেশন সুবিধার সম্প্রসারণ, নির্ভরশীলতার অনুপাত কমে আসা এবং দৈনন্দিন জীবনে আধুনিক প্রযুক্তির (যেমন কম্পিউটার, মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট) ব্যবহার বৃদ্ধিও মানব উন্নয়নে ভূমিকা পালন করেছে।

সরকারি অর্থ ব্যয় ও ব্যবহারে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯' কার্যকর করার মাধ্যমে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রথমবারের মতো জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়। এর ফলে সংসদের নিকট জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার অনুশীলন প্রতিষ্ঠানিক রূপ পায়। বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও নিরীক্ষণ কার্যক্রম জোরদার ও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় বাজেট ও পরিকল্পনা অনুবিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে। বাজেট প্রণয়ন কাজে ধারাবাহিকতা, বাস্তবায়নে বস্তুনিষ্ঠতা, পরিবীক্ষণে নিয়মানুবর্তিতা ও সম্পদ প্রাপ্তিতে নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে প্রণীত তিনসালা মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF) এর আওতায় সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে আনা হয়েছে।

সরকারের দায়িত্ব গ্রহণকালে বিশ্বব্যাপি মূল্যস্ফীতির উচ্চমুখী চাপের প্রভাবে দেশের মানুষের জীবন ধারণে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বসহ চাপ প্রশমনের লক্ষ্যে সরকার টিসিবি'র মাধ্যমে চাল, ডাল, তেল, চিনি, আটাসহ নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য বাজারমূল্যের চেয়ে কমে ও খোলাবাজারে বিক্রয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করে। উপরন্তু, নিত্য

প্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানি শুল্ক হার হ্রাস/মওকুফ করার মাধ্যমে সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নয়ন সাধন করে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার সর্বাত্মক প্রয়াস গ্রহণ করে। একই সাথে সরকার খাদ্যদ্রব্যের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষিতে ভর্তুকির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি করে কৃষকদের উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এতে করে বাজারে ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি ও মূল্য হ্রাস পাওয়ায় মূল্যস্ফীতি সহনীয় মাত্রায় নেমে আসে। মূল্যস্ফীতি হ্রাসের এ ধারা বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ৯.৯ শতাংশ, যা কমে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ৬.৬ শতাংশ এবং নভেম্বর ২০১৩ এ পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে ৬.৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

মূল্যস্ফীতির প্রভাবে সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত চাকুরিজীবীগণের প্রকৃত মজুরির (Real Wage) নিম্নমুখী পতন প্রতিরোধ তথা সামগ্রিকভাবে তাদের জীবন-মান বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে সরকার ২০০৯ সালে নতুন জাতীয় বেতন স্কেল ঘোষণা ও বাস্তবায়ন করে। সর্বস্তরে বেতন-ভাতা গড়ে প্রায় ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়। নতুন বেতন নির্ধারণকালে সকলের জন্য ন্যূনতম ২,০০০ টাকা বেতন বৃদ্ধি নিশ্চিত করা হয়। এ সময়ে প্রথমবারের মতো সরকারি চাকুরিজীবীর সন্তানদের জন্য মাসিক শিক্ষা ভাতা প্রবর্তন করা হয়। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের জুলাই মাস হতে সরকারি চাকুরিজীবীদের জন্য ২০ শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

সরকার কৃষিতে ভর্তুকির পরিমাণ বৃদ্ধি করে উৎপাদন ব্যয় কমানোর মাধ্যমে কৃষকদেরকে অধিক উৎপাদনে আগ্রহী করতে সক্ষম হয়েছে। কৃষিখাতে ভর্তুকি বাবদ ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ব্যয় হয়েছিল ৩,৮৭১.২ কোটি টাকা যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১২,০০০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। ভর্তুকি প্রাপ্তিতে হয়রানি ও অনিয়ম দূর করার জন্য প্রকৃত কৃষকদের মাঝে প্রায় ১ কোটি ৪৩ লক্ষ ৭৫টি কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডবিতরণ করা হয়। উপকরণ সহায়তা কার্ডের মাধ্যমে ব্যাংক হতে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও ঋণ প্রাপ্তির লক্ষ্যে মাত্র ১০ টাকা জামানত প্রদান করে ব্যাংক হিসাব খোলার ব্যবস্থা চালু করা হয়। কৃষিখাতে সরকারের বিশেষ অগ্রাধিকারের ফলে পাঁচ বছরে এ খাতে গড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ৪.০১ শতাংশ। পূর্ববর্তী পাঁচ বছরে এ হার ছিল ৩.৮ শতাংশ। চালের উৎপাদন ২০০৭-০৮ অর্থবছরের ২৮৯.৩১ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৪৪.৩০ লক্ষ মেট্রিক টন। একইভাবে গমের উৎপাদন ৮.৪৪ লক্ষ মেট্রিক টন হতে ১০.৩৬ লক্ষ মেট্রিক টন, ভুট্টার উৎপাদন ১৩.৪৬ লক্ষ মেট্রিক টন হতে ২০.৪২ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য শস্যের উৎপাদন ও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিশ্ব অর্থনীতির মন্দা পরিস্থিতির মাঝেও বাংলাদেশের রপ্তানি সুসংহত হয়েছে। মন্দা মোকাবেলায় সরকার ঘোষিত দু'টি প্রণোদনা প্যাকেজের যথাযথ বাস্তবায়নসহ অন্যান্য অনুকূল পরিবেশ সৃজনের ফলে এটি সম্ভব হয়েছে। রপ্তানি প্রবৃদ্ধির ঊর্ধ্বমুখী ধারার ফলে গত ৫ বছরে গড়ে রপ্তানি হয়েছে ২১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অপরদিকে পূর্ববর্তী পাঁচ বছরে গড়ে রপ্তানি হয়েছে ১০.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ১৪.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১২-১৩ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় দ্বিগুণ অর্থাৎ ২৭.০৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়। অন্যদিকে আমদানি বাড়লেও গড় প্রবৃদ্ধি থাকে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির হারের চেয়ে কম। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে আমদানি হয় ২১.৬২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০১২-১৩ এ তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৪.০৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (পরিশিষ্ট-১১)। পাঁচ বছরে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির বার্ষিক গড় হার ছিল ৩৮.৪ শতাংশ এবং তার বিপরীতে আমদানি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২৮.৬ শতাংশ। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দেশে অধিক পরিমাণে আমদানি বিকল্প শিল্প পণ্য সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া, আমদানির তুলনায় রপ্তানি বেশি হওয়ায় ২০০৭-০৮ অর্থবছরে বাণিজ্য ভারসাম্য দেশের অনুকূলে পরিবর্তিত হয়েছে। এথেকে অনুমান করা যায় যে, জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে অভ্যন্তরীণ চাহিদার পাশাপাশি বহির্বিশ্বের চাহিদাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে (পরিশিষ্ট- ৫ দ্রষ্টব্য)।

প্রবাসী আয়ের ওপর বিশ্বমন্দার নেতিবাচক প্রভাব প্রতিরোধের জন্য সরকার জনশক্তির নতুন বাজার উন্মোচন ও প্রচলিত বাজারসমূহ ধরে রাখার ওপর জোর দেয়। ফলে জনশক্তি রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে দেশে প্রেরিত প্রবাসী আয়ের পরিমাণ ছিল ৭.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা গত ৫ বছরে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রাপ্ত রেমিট্যান্সের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০৯-২০১৩ মেয়াদে প্রবাসী আয়ের

বার্ষিক গড় ১১.৯ বিলিয়ন ডলার। পূর্ববর্তী পাঁচ বছরে প্রবাসী আয়ের গড় ছিল ৫.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ এই পাঁচ বছরে প্রবাসী আয়ের গড় দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। উর্ধ্বমুখী আয়ের পাশাপাশি জনশক্তি রপ্তানির সংখ্যাতেও ২০০৯-২০১৩ মেয়াদের কার্যক্রম পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের তুলনায় যথেষ্ট শক্তিশালী হয়েছে। ২০০৯-২০১৩ মেয়াদে বিদেশে মোট জনশক্তি রপ্তানির পরিমাণ ২৬ লক্ষ ৪৮ হাজার জন, পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী পাঁচ বছরে জনশক্তি রপ্তানি হয় ২৩ লক্ষ ৬৩ হাজার জন। দেখা যাচ্ছে ২০০৯-২০১৩ মেয়াদে বছরে গড়ে জনশক্তি রপ্তানি ৫ লক্ষ ২৯ হাজার ৬০০ জন; পূর্ববর্তী একই সময়ে এটি ছিল গড়ে ৪ লক্ষ ৭২ হাজার ৬০০ জন।

রপ্তানি ও প্রবাসী আয়ের উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং আমদানি ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ১০ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে ১৭.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের এ অনুকূল স্থিতি ছয় মাসের আমদানি ব্যয় পরিশোধের সমপরিমাণ। উল্লেখ্য রিজার্ভের এ স্থিতি দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। বৈদেশিক মুদ্রার পর্যাপ্ত রিজার্ভ থাকায় টাকার মূল্যমান ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হয়ে ডলারের বিপরীতে উপচিতি ঘটেছে। ডলারের বিপরীত টাকার মূল্যমান বৃদ্ধি পাওয়ায় আমদানি ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। মার্কিন ডলার বিপরীতে টাকার মূল্যমান দক্ষিণ এশিয়ায় অন্যান্য দেশগুলোর মুদ্রার তুলনায় অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল ও শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ এর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উন্নয়নে সরকার দায়িত্ব গ্রহণের বছর অর্থাৎ ২০০৯ হতেই বর্ধিত সম্পদ ব্যবহার করে; এই খাতের তীব্র ঘাটতি মোকাবেলা করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের ব্যয় ২০০৭-০৮ অর্থবছরের ২,৮৬২ কোটি টাকা হতে প্রায় চার গুণ বেড়ে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১১,৩৫১ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে পূর্ববর্তী পাঁচ বছর মেয়াদে ব্যয় বৃদ্ধির গড় হার ছিল মাত্র ২.৫ শতাংশ যা ২০০৯-২০১৩ মেয়াদে হয়েছে ৩৩.৭ শতাংশ। এখাতে বর্ধিত ব্যয়ের ফলে ২০০৯-২০১৩ মেয়াদে মোট ৪,৪৩২ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। যার ফলে দীর্ঘদিন যাবৎ বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান বন্ধ অবস্থার অবসান ঘটে নতুন প্রায় ৩০ লক্ষ গ্রাহককে সংযোগ প্রদানের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতায় আনা হয়েছে। এতে করে দেশে বিদ্যুৎ সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৪৭ শতাংশ হতে বেড়ে ৬২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ১৮৩ কিলোওয়াট ঘন্টা থেকে বেড়ে ৩২১ কিলোওয়াট ঘন্টায় উন্নীত হয়েছে। নভেম্বর ২০১৩ নাগাদ দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের এক নতুন মাইলফলক ১০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা অর্জিত হয়। জ্বালানি ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়ে দৈনিক ৬৮০ মিলিয়ন ঘনফুট অতিরিক্ত গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা ২০০৭-০৮ সালের দৈনিক ১,৫৮৬ মিলিয়ন ঘটফুট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২,২৬০ মিলিয়ন ঘটফুটে উন্নীত হয়েছে।

দেশের সামগ্রিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার স্থিতিশীলতার প্রবণতার ফলে আন্তর্জাতিক ঋণমান নিরূপনকারী দু'টি প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে Moody's ও Standard & Poor's (S&P) এর পৃথক মূল্যায়নে বাংলাদেশ বিগত প্রায় চার বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে সন্তোষজনক ঋণমান (Ba^3 ও BB-) অর্জন করেছে। অর্জিত ঋণমানের হিসেবে ঋণ পরিশোধে সক্ষমতার বিচারে বাংলাদেশ ফিলিপাইনস, ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনামের সমকক্ষতা লাভে সক্ষম হয়।

রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বর্ধিত বিনিয়োগ জিডিপি'র ৩২-৩৫ শতাংশে সম্পদের যোগান সরকারের নিজের পক্ষে বহন করা দুরূহ বিধায় অবকাঠামো উন্নয়নে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) উদ্যোগ নীতি ও কৌশল, ২০১০ শীর্ষক নীতিমালা কার্যকর করা হয়।

মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধিজনিত শারীরিক সক্ষমতা বাড়া ও চাকুরিতে নিয়োগের বয়স বৃদ্ধি ইত্যাদি বিবেচনায় মুক্তিযোদ্ধা চাকুরীজীবীগণের অবসরের বয়স ৫৭ বছর হতে বাড়িয়ে ৬০ বছরে এবং অন্যান্য সকল চাকুরীজীবীর বয়স ৫৭ হতে ৫৯ বছরে উন্নীত করা হয়। চাকুরীরত মহিলাদের মাতৃত্বকালীন সময়ে নবজাত সন্তান পালনে নিবিড় সময় দেয়ার লক্ষ্যে মাতৃত্বকালীন ছুটির মেয়াদ পূর্ণকালীন বেতনে ৪ মাস হতে ৬ মাসে উন্নীত করা হয়। দেশের বেকার সমস্যা সমাধানকল্পে ২০০৯ হতে ২০১২ সালের মধ্যে ২ লক্ষ ৫২ হাজার নতুন পদ সৃজন করা হয়।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংক ও আর্থিক খাতের অপরিসীম গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে ব্যাংক ও আর্থিক খাতে অধিকতর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম নিবিড় করার লক্ষ্যে জানুয়ারি ২০১০-এ 'ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ' প্রতিষ্ঠা করা হয়।

দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে ব্যাংকিং কার্যক্রমের আওতায় আনা এবং সকল জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় ব্যাংকিং সেবা প্রদানের জন্য নয়টি নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রবাসীদের কল্যাণে একটি পৃথক 'প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ফলে তফসীলি ব্যাংকের সংখ্যা ২০০৮ সালে বিদ্যমান ৪৭টি হতে বর্তমানে ৫৬টিতে উন্নীত হয়েছে। ব্যাংকের শাখা সংখ্যা ২০০৮ সালে বিদ্যমান ৬,৮৮৬ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩ সালে ৯,৪৮২ টিতে উন্নীত হয়েছে। নতুন শাখা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্ততঃ অর্ধেক শাখা পল্লী/গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠার নির্দেশনার ফলে শহরের (৩,৬৩০) তুলনায় গ্রামে (৪,৮৫২টি) বেশি ব্যাংক শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্যাংকের শাখা বিস্তারের ফলে ব্যাংকগুলোতে মোট আমানত/ সঞ্চয়ের পরিমাণ ২০০৮ সালের ২,৫২,৭৫৬ কোটি টাকা হতে বিগত পাঁচ বছরে প্রায় ১৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৫,৯২,৪৮২ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে।

বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি কর্তৃক সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণকল্পে তথ্য আদান-প্রদানের নিমিত্ত ই-রেগুলেটরি সিস্টেম চালু করা হয়েছে। আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে ক্ষুদ্রঋণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থানের পাশাপাশি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি গ্রামীণ অর্থনীতিতে অর্থের যোগান বাড়াচ্ছে। ক্ষুদ্রঋণের বহুমাত্রিকতার বিষয় বিবেচনা করে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে বছরে প্রায় ২ হাজার ২ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়। অপরদিকে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিয়োজিত নিবেদিত এনজিওসমূহ কর্তৃক বছরে প্রায় ৩১ হাজার ৩৪৩ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বছরে প্রায় ৩৩ হাজার ৩৪৫ কোটি টাকা সঞ্চালিত হচ্ছে।

দেশের অর্থনীতিতে আর্থিক সুরক্ষা প্রদানকারী বীমাখাত সুদীর্ঘকাল ধরে বীমা আইন ১৯৩৮ এবং বীমা বিধিমালা ১৯৫৮ এর আলোকে পরিচালিত হচ্ছিল। কিন্তু অতি পুরোনো বীমা আইন ও বিধিমালার সীমাবদ্ধতা এবং যুগোপযোগিতার কথা বিবেচনা করে সরকার যথাক্রমে বীমা আইন, ২০১০ এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন,২০১০ প্রণয়ন করে। প্রণীত আইনের ফলে বীমা অধিদপ্তর বিলুপ্ত হয়ে 'বাংলাদেশ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ' গঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কার্যকর ভূমিকায় এ খাতে শৃংখলা বিধান ও নিয়ম-কানুন প্রতিপালনের ফলে একদিকে গ্রাহক স্বার্থ রক্ষার নিশ্চয়তা পাওয়া যাচ্ছে, অন্যদিকে বীমা খাতে প্রতিযোগিতা ও গতিশীলতা আনয়নের মাধ্যমে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আর্থিক খাতে এর অধিকতর ভূমিকা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক কর্মকান্ড অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে। এতে করে দেশে আধুনিক পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট সিস্টেম এর গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ স্থাপিত হয়েছে।

সরকারের সামষ্টিক অর্থনৈতিক সাফল্যের প্রভাব পুঁজি বাজারেও পরিলক্ষিত হয়। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের ফলে বিনিয়োগকারীরা বিপুল সংখ্যায় পুঁজি বাজার অভিমুখী হয়। এতে করে পুঁজিবাজারের সাধারণ মূল্যসূচক এবং দৈনিক লেনদেন উভয়ই বৃদ্ধি পায়। পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের বিপুল চাহিদার কারণে মূল্যসূচক ও লেনদেন উভয়ই জ্যামিতিক হারে বাড়ার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এ অবস্থায় পুঁজিবাজারের স্বাভাবিক নিয়মে ২০১০ সালের শেষের দিকে বড় ধরণের মূল্য সংশোধন (Major Correction) ঘটে। এ পরিস্থিতিতে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) ঢেলে সাজানো হয় এবং একটি দক্ষ কমিশন আইন ও বিধি-নিষেধের ফাঁক-ফোকরের সংস্কার করে। বিনিয়োগকারীদের সতর্ক ও সচেতন করে তোলে এবং জালিয়াতি ও দুর্নীতিপ্রবণ দালালিকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে এক বছরের মধ্যে পুঁজিবাজারে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। ২০১২ সাল থেকে পুঁজিবাজার স্থিতিশীল একটি নির্ভরযোগ্য মানে অবস্থান করছে এবং পুঁজি সরবরাহে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

পুঁজিবাজারের বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ করে বিনিয়োগে সচেতনতা সৃষ্টি ও দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (বিআইসিএম) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পুঁজিবাজারে যোগসাজস ও অনিয়ম চিহ্নিত করা, বাজার পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়া শক্তিশালী করার লক্ষ্যে একটি আন্তর্জাতিক মানের সার্ভেইলান্স সফটওয়্যার (Surveillance Software) স্থাপন করা হয়েছে। মার্জিন ও মার্জিন বহির্ভূত বিও হিসাবধারী ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জুন ২০১২ হতে জুন ২০১৩ সময়কালে ইস্যুকৃত সকল পাবলিক ইস্যুতে ২০ শতাংশ কোটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। উপরন্তু, পুঁজি বাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়াগকারীদের সহায়তার জন্য নয়শত কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। পুঁজিবাজারের উন্নয়নের জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আইন সংশোধন ও প্রণয়ন করা হয়েছে। সর্বোপরি বাজার ব্যবস্থাপনা ও বাজারে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে স্বতন্ত্র অবস্থান তৈরির জন্য 'এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করে এর বাস্তবায়ন জোরদার করা হয়েছে।

সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য আয় বৃদ্ধি অপরিহার্য। সরকারের আয় নির্ভর করে মূলতঃ রাজস্ব আহরণের ওপর। রাজস্ব আহরণের মাপকাঠিতে ২০০৯-২০১৩ সময়কাল এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। এ সময়কালে রাজস্ব আদায় প্রবৃদ্ধি এবং কর-জিডিপি অনুপাত স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সবচেয়ে বেশি হয়েছে। এ সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ধারা হচ্ছে প্রত্যক্ষ আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর সংগ্রহের হার ক্রমান্বয়ে বেড়েছে; যা দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুসংহত ও শক্তিশালী অবস্থার ইঙ্গিত বহন করে। পূর্ববর্তী পাঁচ বছরে যেখানে বার্ষিক বাজেটের সমাহার ছিল ২৫৮ হাজার কোটি টাকা সেখানে শুধু ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বাজেটের কলেবর হয়েছে ২২২ হাজার কোটি টাকা। গত পাঁচ বছরে মোট বাজেট ছিল ৭৭৯ হাজার কোটি টাকা যা পূর্ববর্তী দশ বছরের মোট বাজেটের (৭৮৫ হাজার কোটি টাকা) প্রায় সমতুল্য। এর ফলে প্রতিটি খাতে সরকারি ব্যয় এই পাঁচ বছরে পূর্ববর্তী বরাদ্দের জায়গায় সর্বনিম্ন দেড় গুণ থেকে সর্বোচ্চ চার গুণ বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে পরিবহন ও যোগাযোগ এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের ব্যয় বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে।

পূর্ববর্তী পাঁচ বছর মেয়াদে গড়ে রাজস্ব সংগৃহীত হয় বছরে ৪০,০১২ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে, ২০০৯-২০১৩ মেয়াদে গড়ে রাজস্ব আদায় হয়েছে ৮৪,৫৫৬ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী সময়ের দুই গুণেরও বেশি (১১১.৩%)। কর-রাজস্ব আদায়ে সরকারের সাফল্যের পেছনে ভূমিকা রেখেছে শুল্ক ও কর ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ। নতুন কর ও শুল্ক সার্কেল সৃষ্টি এবং বর্ধিত জনবল নিয়োগ, রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তি-ভিত্তিক কাঠামো গঠন, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার প্রবর্তন, রিটার্ণ দাখিল ফরম সহজীকরণ, অন-লাইনে রিটার্ণ দাখিল কার্যক্রম শুরু করা এবং আইন ও বিধিতে যথাযথ সংশোধন এনে কর্মকর্তাদের একক ক্ষমতা (Discreationary Power) হ্রাস করার বিষয় উল্লেখযোগ্য। সৎ করদাতাদের উৎসাহিত করার জন্য সীমিত সংখ্যক সর্বোচ্চ করদাতাকে Tax Card প্রদান করা হচ্ছে। রাজস্ব আদায়ে এ সময়কালের আরো একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, প্রধান বিচারপতি, মন্ত্রী, বিচারপতি এবং সংসদ সদস্যবৃন্দের পারিতোষিক হতে প্রদত্ত আয়কে করের আওতায় আনয়ন। একই সাথে সরকারি চাকুরিজীবীদেরকেও ব্যক্তিগত কর প্রদানের ব্যবস্থায় আনা হয়েছে। এসবের মধ্যে সবচেয়ে কৃতিত্বপূর্ণ হচ্ছে রাজস্ব আদায়ের পরিবেশ করদাতা বান্ধব করা এবং কর প্রদানে হয়রানি ব্যাপক হারে দূরীভূত করা।

বাংলাদেশের অর্থনীতির ২০০৯-২০১৩ মেয়াদের বিকাশে বিদেশী রাষ্ট্র এবং উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানেরও ইতিবাচক ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ২০১০ সালে ১৮টি উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থার সাথে যৌথ সহযোগিতা কৌশলপত্র (Joint Cooperation Strategy- JCS) স্বাক্ষর করা হয়েছে। উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থা কর্তৃক সরকারের নীতি-কৌশল, প্রাধিকার ও কর্মপদ্ধতি অনুসরণের দিক-নির্দেশনাসমূহ যৌথ সহযোগিতা কৌশলপত্রে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহারের হিসাব বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০৯-২০১৩ মেয়াদে গড়ে প্রায় ২.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। পক্ষান্তরে, পূর্ববর্তী পাঁচ বছরে গড় ব্যবহার ছিল ১.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। দেখা যাচ্ছে যে, গড়ে প্রায় ৩৭ শতাংশ বেশি বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহার করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতা উত্তরকালে ২০১২-১৩ অর্থবছরে বৈদেশিক সাহায্যের অঙ্গীকার হিসেবে ৫.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সর্বোচ্চ চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। এই পাঁচ বছরে অঙ্গীকার হয়েছে ২২.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, পূর্ববর্তী পাঁচ বছরে যা ছিল ১০.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

সরকারের গৃহীত কার্যকর অর্থনৈতিক নীতি কৌশলের সফল বাস্তবায়নের ফলে দেশে ২০০৯-২০১৩ মেয়াদে গড়ে ৬.২ শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বৈশ্বিক মন্দাত্তোরকালে বিশ্বের অল্প যে ক'টি দেশ ৬ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম। উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারাবাহিকতায় মাথাপিছু জাতীয় আয় ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে ৬০৮ মার্কিন ডলার হতে প্রায় ৭১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩ সালে ১০৪৪ [১]মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু জাতীয় আয় ২০০৯-২০১৩ মেয়াদে বছরে গড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে ৮.৮ শতাংশ। পক্ষান্তরে, ২০০৪-২০০৮ সময়ে এ হার ছিল ৮.২ শতাংশ। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ২/৩ বছরের মধ্যেই বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবে।

[১]রিভিসড ২০০৫-০৬

অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিগত পাঁচবছরের কার্যক্রমের বিভাগভিত্তিক বিবরণ

বৈষম্যহীন, দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বিগত পাঁচ বছরে অর্থ মন্ত্রণালয় ঐকান্তিক ও নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অনুকূল ধারা বজায় রাখতে এ সময়ে মন্ত্রণালয়াধীন প্রতিটি বিভাগ[1] স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কার আনয়নসহ সার্বিক কাজকর্ম সম্পাদন করেছে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পদ জোগাতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রচেষ্টা যেমন ছিল নিরলস তেমনি সহজশর্তের বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তিতে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের তৎপরতা ছিল লক্ষ্যণীয়। ২০০২-০৩ অর্থবছরে এনবিআর রাজস্ব আদায় যেখানে ছিল জিডিপি'র মাত্র ৭.৯ শতাংশ, ২০১২-১৩ অর্থবছরে তা উন্নীত হয়েছে জিডিপি'র ১০.৫ শতাংশে। অন্যদিকে রাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালনে অর্থ বিভাগের দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে সামাজিক ও ভৌত অবকাঠামো বিনির্মাণে অগ্রাধিকার ভিত্তিক সম্পদ বণ্টন, বাজেট ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ; রাজস্ব, মুদ্রা ও বৈদেশিক বিনিময় হার নীতির যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং আর্থিক বিধিবিধান প্রণয়নে অর্থ বিভাগের সুবিবেচনাপ্রসূত কর্মকাণ্ড এনেছে অভাবনীয় সাফল্য। পাশাপাশি আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা রক্ষা, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ আর প্রবৃদ্ধি সহায়ক মুদ্রানীতি প্রণয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ পালন করেছে প্রশংসনীয় ভূমিকা।

বিগত পাঁচ বছরে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মপ্রচেষ্টার প্রতিফলন ঘটেছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন আর সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীল অবস্থানে। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা আর সময়ে সময়ে অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার মাঝেও অব্যাহতভাবে ৬ শতাংশের অধিক প্রবৃদ্ধি, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, সর্বোপরি সামাজিক চলকসমূহে অভাবনীয় অগ্রগতি বিশ্ববাসীকে করেছে বিস্মিত। Goldman Sachs এবং Citi Group এর মত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ আগামীতে উন্নয়ন সম্ভাবনাময় দেশগুলোর কাতারে অন্তর্ভুক্ত করেছে বাংলাদেশকে।

[1] কার্যবিধি ১৯৯০ অনুযায়ী অর্থমন্ত্রণালয়ের অংশ হলো অর্থ বিভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ নামে তিনটি বিভাগ। পরবর্তীতে ২০১০ সালে এর সাথে যুক্ত হয়েছে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ নামে আরো একটি বিভাগ।

১.০ অর্থ বিভাগ

রাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্ব অর্থ বিভাগের ওপর ন্যস্ত। মধ্যমেয়াদে অর্থনীতির সার্বিক গতিধারা মূল্যায়ন ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো প্রণয়ন; রাজস্ব নীতি প্রণয়ন এবং এর সাথে মুদ্রানীতি ও বিনিময় হার নীতির সমন্বয়,মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় জাতীয় বাজেট প্রস্তুত ও বিভিন্ন খাতে সম্পদ বরাদ্দ, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য নীতি ও বিধি প্রণয়ন এবং সরকারি ব্যয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ অর্থবিভাগের প্রধান দায়িত্ব।এ বিভাগ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের বাজেট প্রণয়ন এবং আর্থিক বিধিবিধান প্রণয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলীও সম্পাদন করে থাকে। অর্থ বিভাগের সার্বিক কর্মকান্ডের মূল লক্ষ্য হলো-

- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিত্বরান্বিতকরণ ও দারিদ্র্য নিরসন
- দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতারক্ষা
- আর্থিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সম্পদের সুষম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও অপচয় রোধ
- সম্পদের সুষম বন্টন ও সম্পদ ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ
- বাজেট বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সহায়তা প্রদান ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ
- সামগ্রিকভাবে আর্থিক খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগ এবং রপ্তানি খাতকে উৎসাহিতকরণ

১.১ বিগত পাঁচ বছরের কার্যক্রম

১.১.১ বাজেট প্রণয়ন, সম্পদ বন্টন ও ব্যয় ব্যবস্থাপনা

মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় বাজেট প্রণয়ন

অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে প্রতি অর্থবছরে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল সভার মাধ্যমে মধ্যমেয়াদে বৈশ্বিক ও জাতীয় অর্থনীতির সামগ্রিক গতিধারা বিশ্লেষণ এবং রাজস্ব, মুদ্রা ও বিনিময় হার নীতির সমন্বয় সাধন করে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো চূড়ান্তকরণে অর্থ বিভাগ মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে। এই কাঠামোর ভিত্তিতে রাষ্ট্রের মৌলিক নীতিকৌশলসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় প্রতি অর্থবছরে জাতীয় বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো ও মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণের নির্ভরযোগ্যতা ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সামষ্টিক অর্থনৈতিক মডেল ও ডাটাবেইজ তৈরির কাজ চলছে। উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কার্যক্রম সুষ্ঠু করতে একটি খসড়া নীতিমালাও চূড়ান্ত করা হয়েছে।

সম্পদ বন্টন

সম্পদ বন্টন প্রক্রিয়াকে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের কর্মকৃতির সাথে সম্পৃক্তকরণের জন্য কর্মকৃতি মূল্যায়নের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগে বাজেট অনুবিভাগ/শাখা খোলা হয়েছে। ৫টি মন্ত্রণালয়ে মধ্যমেয়াদি কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা তৈরির কাজ চলছে। বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া অনেকখানি শক্তিশালী করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক রীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাজেট শ্রেণিবিন্যাস কাঠামো সংশোধন করার কাজ প্রায় চূড়ান্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন খাতে সম্পদ বরাদ্দের বিভিন্ন দিক পরিশিষ্ট ১ থেকে ৪ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা

যথাযথ ব্যয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরকারি ব্যয় যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার বিষয়ে শুরু থেকেই প্রচেষ্টানেয়া হয়। অর্থবছর ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ এ সরকারি ব্যয় ও জিডিপি'র অনুপাত ছিল যথাক্রমে ১৪.৩, ১৪.৬, ১৬.১, ১৬.৫ ও ১৬.৮ শতাংশ। বস্তুত বিগত পাঁচবছরে রাজস্ব নীতি প্রণয়নে অর্থ বিভাগ যথেষ্ট প্রাজ্ঞতার পরিচয় দেয়। সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনায় অর্থ

বিভাগে গৃহীত নীতিকৌশলসমূহের কারণে একদিকে যেমন মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় অন্যদিকে গুরুত্বপূর্ণ ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো খাতে অগ্রাধিকারভিত্তিক সম্পদ সঞ্চালনের ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সুসংহত হয়। ব্যয় ব্যবস্থাপনায় অর্থ বিভাগের গৃহীত নীতি ও কৌশলসমূহের মধ্যে ছিল –

- ভর্তুকি ও রাজস্ব সংক্রান্ত ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে জ্বালানি মূল্য সমন্বয়। আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাজারের মধ্যকার জ্বালানি মূল্যের ব্যবধান ন্যূনতম পর্যায়ে রাখার পরিকল্পনা গ্রহণ
- বাজেট ঘাটতি অব্যাহতভাবে জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যে সীমিত রাখা
- ঘাটতি অর্থায়নে সহজ শর্তে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের প্রচেষ্টা জোরদারকরণ
- ব্যক্তি খাতে ঋণপ্রবাহ ও বিনিয়োগ সচল রাখার উদ্দেশ্যে অভ্যন্তরীণ বা ব্যাংক উৎস হতে ঋণ গ্রহণ সীমিত পর্যায়ে রাখা

ঘাটতি অর্থায়ন

মুদ্রা সরবরাহসহ সার্বিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি অর্থায়নের প্রভাবের বিষয়টি মাথায় রেখে এ বিষয়ে শুরু থেকেই সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। ২০০৯ সালে প্রণীত সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন এর বাধ্যবাধকতার আলোকে বাজেট ঘাটতি ক্রমান্বয়ে কমিয়ে এনে একে জিডিপি'র শতকরা ৫ শতাংশের মধ্যে সীমিত রাখা হয়। এ লক্ষ্যে একদিকে যেমন অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণের ওপর জোর দেয়া হয়, অন্যদিকে তেমন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ভর্তুকি ব্যয় হ্রাসের জন্য মূল্য সমন্বয়, অর্থ ছাড়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ ও উপযোগী আর্থিক বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয়। পাশপাশি সহজ শর্তের বৈদেশিক সহায়তা লাভের জন্যও পদক্ষেপ নেয়া হয়। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সাথে প্রায় ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সহজ শর্তের ঋণ সহায়তা (Extended Credit Facility) চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। এছাড়াও সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে আধুনিক সফটওয়্যার স্থাপন এবং সরকারের শেয়ার ও ইক্যুইটির হিসাব ব্যবস্থাপনায় ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে।

আইনগত সংস্কার

বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব প্রদানে দায়বদ্ধতা, জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা অর্জনসহ আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা রক্ষার লক্ষ্যে যে সকল আইনী ও বিধিগত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে বাজেট ও পরিকল্পনা শাখা সৃজন
- সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ প্রণয়ন
- উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের অর্থনৈতিক কোডভিত্তিক ম্যাপিং শুরু করা
- সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতাভুক্তকরণ
- জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন
- জেলা বাজেট প্রণয়ন শুরু করা (টাঙ্গাইল জেলার জন্য প্রথমবারের মত পরীক্ষামূলক জেলা বাজেট পেশ)
- সামষ্টিক অর্থনৈতিক মডেল ও ডাটাবেইজ তৈরি
- মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিকৌশল প্রণয়ন
- সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা উন্নয়নে লক্ষ্যে আধুনিক সফটওয়্যার সংগ্রহ ও স্থাপন
- বিভিন্ন সংস্থায় সরকারের ইক্যুইটির হিসাব সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডাটাবেইজ প্রস্তুত
- পরীক্ষামূলকভাবে কর্মকৃতিভিত্তিক নিরীক্ষা (Performance Audit) কার্যক্রম শুরু করা
- মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ প্রণয়ন
- সন্ত্রাস বিরোধ (সংশোধন) আইন, ২০১২ প্রণয়ন

- বীমা আইন, ২০১০ পাশ
- সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জকমিশন (মিউচুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ সংশোধন
- সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জকমিশন (পাবলিক ইস্যু) বিধিমালা, ২০০৬ সংশোধন
- দি এক্সচেঞ্জেস (ডিমিউচুয়ালাইজেশন) অ্যাক্ট, ২০১৩ পাশ
- সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জকমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ সংশোধন
- সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জকমিশন আইন, ১৯৯০ সংশোধন
- সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ অধ্যাদেশ, ১৯৬৯ সংশোধন
- সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (প্রাইভেট প্লেসমেন্ট অব ডেট সিকিউরিটিজ) রুলস, ২০১২ প্রণয়ন
- ব্যাংকিং আইন, ১৯৯১ এর সংশোধন
- বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ প্রণয়ন
- পিপিপি পলিসি ও নীতি এবং গাইড লাইনস, ২০১০ গেজেট আকারে প্রকাশ
- Viability Gap Fund ব্যবহারের জন্য গাইডলাইন ও স্কীম প্রকাশ
- প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিবর বেতন-ভাতা, পেনশন, পে-রোল, এবং অন্যান্য তথ্য সম্বলিত তথ্য ভান্ডার তৈরির কাজ শুরু

১.১.২ বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলা ও অব্যাহত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন

২০০৭ সাল থেকে শুরু হওয়া অর্থনৈতিক সংকট বিশ্বের অনেক উন্নত অর্থনীতির দেশকে নাজুক অবস্থানে ফেলে দেয়। এর ফলাফলস্বরূপ, উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও জিডিপি-র প্রবৃদ্ধি, ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় এবং বিনিয়োগ হ্রাস পায়। অথচ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার দক্ষতায় বাংলাদেশ বৈশ্বিক মন্দার অভিঘাত মোকাবেলা করে অত্যন্ত সফলতার সাথে। বজায় রাখে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির টেকসই গতিধারা। ২০১২-১৩ অর্থবছরে জিডিপি-র প্রবৃদ্ধির মাপকাঠিতে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। এছাড়া অব্যাহতভাবে উচ্চ গড় প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে বিশ্বের এমন দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সামনের কাতারে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে মাথাপিছু জিডিপি ৯৬০ মার্কিন ডলার এবং মাথাপিছু জাতীয় আয় ১০৪৪[২] মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। মূল্যস্ফীতি নেমে এসেছে সহনীয় পর্যায়ে (২০১২-১৩ গড় মূল্যস্ফীতি ৭.৭%[৩])। সংকটাপন্ন বিশ্ব অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যেও বাংলাদেশের অব্যাহত অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার পিছনে প্রধান নিয়ামক ছিল:

বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার অভিঘাত মোকাবেলা

বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার অভিঘাত মোকাবেলায় প্রাথমিক পর্যায়ে প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণাসহ যে সকল কৌশল গ্রহণ করা হয় তা হচ্ছে –

- ২০০৯ সালের এপ্রিল মাসে বিভিন্ন নীতি প্রণোদনাসহ ৩০ হাজার ৪২৪ কোটি টাকার আর্থিক সুবিধা সম্বলিত প্রথম প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা
- রপ্তানি খাতে নগদ সহায়তা/ভর্তুকির পরিমাণ ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৩০০ কোটি টাকা বাড়িয়ে ২ হাজার ১০০ কোটি টাকায় উন্নীতকরণ
- ২৫ নভেম্বর, ২০০৯ তারিখে ঘোষিত দ্বিতীয় প্রণোদনা প্যাকেজে ক্ষুদ্র ও মাঝারি বস্ত্র শিল্প, জাহাজ নির্মাণ শিল্প এবং ফিনিশড্ ও ক্রাস্ট লেদার শিল্পের উন্নয়নে নগদ সহায়তা প্রদান

[২] ২০০৫-০৬ ভিত্তিবছর, বিবিএস
[৩] বাংলাদেশ ব্যাংক

- বস্ত্র খাতে নতুন পণ্য রপ্তানি ও নতুন বাজার প্রতিষ্ঠার জন্য রপ্তানি আয়ের ওপর বর্ধিত ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা রাখা
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি বস্ত্রশিল্প খাতের জন্য ২০০৯-১০ অর্থবছরে পূর্ববর্তী অর্থবছরের রপ্তানির ওপর অতিরিক্ত ৫ শতাংশ হারে রপ্তানি প্রণোদনা প্রদান
- তৈরি পোশাক ও বস্ত্রখাতে বন্ডেড ওয়্যারহাউজের মাধ্যমে শুল্কমুক্ত কাঁচামাল আমদানির সুবিধা বহাল রাখা
- রপ্তানিমুখী শিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানির অর্থায়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল বর্ধিতকরণ
- ২৭০টি পোশাক প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিটসহ রপ্তানিমুখী বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্পের সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ
- রপ্তানি পণ্যের বাজার কেন্দ্রিকতা ও এ সম্পর্কিত ঝুঁকি হ্রাসে নতুন নতুন বাজারে প্রবেশাধিকার লাভের জন্য কূটনৈতিক প্রচেষ্টা জোরদারকরণ
- বাজার সম্প্রসারণের পাশাপাশি পণ্য বহুমুখীকরণের প্রচেষ্টার ফলে চামড়াজাত পণ্য, আসবাব ইত্যাদি নতুন ধরনের পণ্য রপ্তানি
- অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রপ্তানি পণ্য ও বাজার সম্প্রসারণে নীতি সহায়তা প্রদান
- মন্দা মোকাবেলায় তৈরি পোশাক শিল্পসহ অন্যান্য খাতকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে (২০০৯-১০ অর্থবছরে) ঋণের সুদের সর্বোচ্চ সীমা (১২% থেকে ১৩%) নির্ধারণ করা
- মন্দার অভিঘাত মোকাবেলায় সহযোগিতা করার লক্ষ্যে পোশাক শিল্পসহ অন্যান্য রপ্তানিমুখী শিল্পকে ঋণ পুনঃবিন্যাসের সুবিধা প্রদান করা

অভ্যন্তরীণ চাহিদার গতি সচল রাখা

প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যয়ভিত্তিক খাতওয়ারি অবদান পর্যালোচনায় দেখা যায় ২০০২ সালের জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ছিল ৪.৪ শতাংশ। এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ চাহিদার অবদান ছিল ২.৭ শতাংশ। ২০১১-১২ অর্থবছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.২৩ শতাংশ, যেখানে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির অবদান ছিল ৬.১ শতাংশ (পরিশিষ্ট-৫)। এথেকে অনুমান করা যায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি হলো অভ্যন্তরীণ চাহিদা।

চিত্র ১: জিডিপি প্রবৃদ্ধির খাতভিত্তিক অবদান

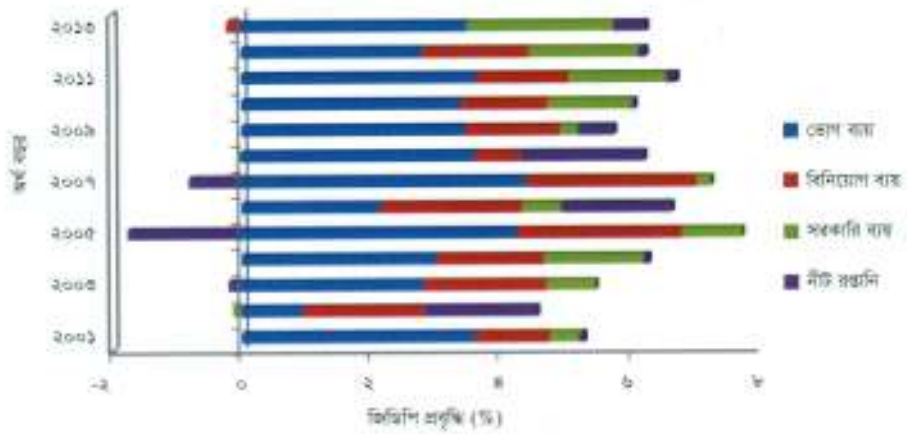

কৃষিখাত ও গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখতে সরকারের বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ, উচ্চ রেমিট্যান্স প্রবাহ, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে নীতি-সহায়তাসহ বিভিন্ন প্রণোদনা প্রদানের ফলে অভ্যন্তরীণ চাহিদার গতি সচল রয়েছে। কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে কৃষি জমির আওতা সম্প্রসারণ, কৃষি উপকরণ সহায়তা প্রদান, মানসম্মত বীজ সরবরাহ, বন্যা ও লোনা পানি সহিষ্ণু শস্য উদ্ভাবন, কৃষকদের জন্য ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলা, উৎপন্ন শস্য বাজারজাত করণে সহায়তা প্রদানের মত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করা হয়। অন্যদিকে গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখতে গ্রামীণ অবকাঠামো, পল্লী আবাসন, স্যানিটেশন, ভূমি ও পানি, মৎস্য ও প্রানিসম্পদ, পল্লী বিদ্যুতায়ন এবং গ্রামাঞ্চলে অকৃষি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশকে একটি সামগ্রিক পরিকল্পনার আওতায় এনে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ করা হয়।

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত খাদ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ক্ষমতা সম্প্রসারণের ওপর জোর দেয়া হয়। সরকারের খাদ্য মজুদ ক্ষমতা ১৪ লক্ষ টন থেকে বাড়িয়ে ১৯ লক্ষ টনে উন্নীত করা হয়েছে[৫]। পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ চাহিদার চলমান ধারা বজায় রাখার জন্য লক্ষ্যভিমুখী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা সম্প্রসারণ করা হয়। বিদ্যুৎ সমস্যাসহ অন্যান্য যোগান সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে (জ্বালানি, বন্দর, পরিবহণ ও যোগাযোগ) চাহিদানুপাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালন এবং জ্বালানি বহুমুখীকরণে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। বিশেষ গুরুত্ব পায় পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সমন্বিত উন্নয়নের বিষয়টি। সর্বোপরি ব্যক্তি খাতের আস্থা অর্জন এবং ব্যক্তি উদ্যোগকে সহায়তা প্রদান, বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃজনের লক্ষ্যে ব্যবসা ব্যয় হ্রাসের জন্য বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা ও অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনের মত কার্যক্রমসমূহ দেশি ও বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

অভ্যন্তরীণ চাহিদার গতি সঞ্চালক এ সকল কার্যক্রমে নীতি কৌশলপ্রণয়ন, সম্পদ বরাদ্দ, বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণসহ বিভিন্ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা পালন করে অর্থ বিভাগ।

বিদ্যুৎ সংকটের মোকাবেলা করে চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ বৃদ্ধি ও জ্বালানি বহুমুখীকরণ

বিদ্যুৎ ও জ্বালানির চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেবিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করে শুরুতেই প্রণয়ন করা হয় 'Power Sector Master Plan'। এর আওতায় গৃহীত নানামুখী কর্মকাণ্ডের ফলে জানুয়ারি ২০০৯ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত জাতীয় গ্রীডে ৪ হাজার ৪৩২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ নতুনভাবে সংযোজিত হয়েছে। বিদ্যুতের সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৪৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ৬২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ১৮৩ কিলোওয়াট আওয়ার থেকে বেড়ে ৩২১ কিলোওয়াট আওয়ারে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১০ হাজার মেগাওয়াট অতিক্রম করেছে। একই সাথে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নতুন উৎস অনুসন্ধান ও জ্বালানি বহুমুখী করণের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। তেল গ্যাস অনুসন্ধান, উৎপাদন, বিতরণ ও এ খাতের উন্নয়নে বিনিয়োগের লক্ষ্যে গঠন করা হয়েছে 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল'। এছাড়া শক্তিশালী করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় তেল-গ্যাস অনুসন্ধানকারী প্রতিষ্ঠান বাপেক্সকে। এসকল উদ্যোগের ফলে ১৯টি গ্যাস ক্ষেত্র থেকে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২ হাজার ২৬০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। দৈনিক গড়ে ৬৮০ ঘনফুট অতিরিক্ত গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হচ্ছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের জ্বালানি মজুদ ক্ষমতা উন্নীত হয়েছে ৯ লক্ষ ৮৩ হাজার মেট্রিক টনে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে অব্যাহত অর্জনের পেছনে অর্থ বিভাগের ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বিদ্যুৎ বিভাগের সহায়তায় এবং অর্থ বিভাগের উদ্যোগ, প্রচেষ্টা ও শ্রমে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে প্রণীত হয়েছে সমন্বিত কর্ম পরিকল্পনা এবং রচিত হয়েছে অর্থবছর ভিত্তিক কর্মকৌশল। অন্যদিকে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে প্রয়োজনীয় ভর্তুকি মূল্যস্ফীতির ওপর যেন বাড়তি চাপ তৈরি না করে তা নিশ্চিত করতে মূল্য সমন্বয়সহ সরকারি ব্যয় ব্যবস্থপনায় অর্থ বিভাগকে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়েছে। তদুপরি আবশ্যকীয় আবকাঠামো নির্মাণসহ প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনাগত ব্যয় নির্বাহে প্রয়োজনীয় সম্পদ সঞ্চালন, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর মত সংশ্লিষ্ট স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহের দায় পরিশোধসহ বিভিন্ন আঙ্গিকে বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি খাতের অব্যাহত উন্নয়নে বিগত পাঁচ বছরে অর্থ বিভাগ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

---

[৫] খাদ্য অধিদপ্তর

কর্মসংস্থান

বিগত পাঁচ বছরে কৃষি ও গ্রামীণ খাতে উচ্চমাত্রার ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি,শ্রমঘণ শিল্প স্থাপন এবং ঋণ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ সামগ্রিকভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিসহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। অর্থ বিভাগে সম্পাদিত গবেষণাকর্মের ভিত্তিতে শুরু করা হয়েছে ১০০ দিনের কর্মসৃজন কর্মসূচি এবং উচ্চ মাধ্যমিক ও সমপর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন যুবক/যুবতীদের জন্য গঠন করা হয়েছে ন্যাশনাল সার্ভিস।ন্যাশনাল সার্ভিস গঠন, ১০০ দিনের কর্মসৃজন, চর জীবিকায়ন ইত্যাদি লক্ষ্যনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রামীণ জনপদে মৌসুমী বেকারত্ব দূর করেছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে হতে ২০১২-১৩ বছর পর্যন্ত অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থানে ৪,৫৬৩ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বরাদ্দ ৩০১৪ কোটি টাকা। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণির পদ সৃষ্টি, সংরক্ষণ, স্থায়ীকরণ, স্থানান্তর ও প্রয়োজনে বিলুপ্তকরণের মাধ্যমেও অর্থ বিভাগ কর্মসৃজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সরকারি খাতের পাশাপাশি দ্রুত বিকাশমান বেসরকারি খাতও কর্মসংস্থানে অবদান রেখেছে।

অভ্যন্তরীণ শ্রমবাজার ছাড়াও বিদেশে শ্রমশক্তি রপ্তানি বাড়াতে বিভিন্ন নীতি কৌশল প্রণয়ন ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পুরোনো শ্রমবাজারে জনশক্তির চাহিদা বাড়ার পাশাপাশি নতুন নতুন শ্রমবাজার উন্মুক্ত হয়েছে। সরকারি ব্যবস্থাপনায় স্বল্প ব্যয়ে মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে;অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ডাটাবেইজ নেটওয়ার্ক স্থাপন ও তা থেকে কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে। বিমান বন্দরে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক স্থাপন ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রবাসী কল্যাণ শাখা খোলা হয়েছে। প্রণয়ন করা হয়েছে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩'। অভিবাসী শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য 'দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল গঠন' করে তার মাধ্যমে বিদেশে শ্রম বাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। অভিবাসী শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল' গঠন করা হয়েছে।'দক্ষতা উন্নয়ন, জনশক্তি ও রেমিট্যান্স সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি'গঠনের মাধ্যমে আন্ত:মন্ত্রণালয় কার্যক্রমের সমন্বয় করা হচ্ছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান তথা শ্রমিক রপ্তানিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে বিনিয়োগ সুবিধা সম্প্রসারণসহ প্রবাসীদের কল্যাণার্থে সরকার 'প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক' স্থাপন ও শাখা সম্প্রসারণকরা হয়েছে।সরকারের এসকল কার্যক্রমের ফলে বাংলাদেশ হতে বর্তমানে ১৫৭টি দেশে কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। ২০০৯ সাল হতে ২০১২ সাল পর্যন্ত ২০ লক্ষ ৪০ হাজার কর্মীর বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে।

দেশে ও প্রবাসে কমর্সৃজন ও দক্ষতা উন্নয়নে তহবিল গঠন, ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা, নীতি সহায়তা ও নির্দেশনা প্রদান, বেসরকারি খাতের বিকাশোপযোগী পরিবেশ সৃজন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিগত পাঁচ বছরে অর্থ বিভাগের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করেছে।

মানব উন্নয়ন

সুস্থ, শিক্ষিত, দক্ষ ও সচেতন জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাত ছাড়াও সাংস্কৃতিক বিকাশে অবকাঠামো উন্নয়ন, নীতিগত ও কাঠামোগত সংস্কারে পর্যাপ্ত সম্পদ সঞ্চালনসহ নীতিগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে অর্থ বিভাগের পক্ষ হতে। শিক্ষাখাতে বিগত পাঁচ বছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে-প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শতভাগ শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে বই বিতরণ, 'শিক্ষানীতি ২০১০' ও 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০০৯' প্রণয়ন, সুবিধাবঞ্চিত ৭ লক্ষ শিশুকে শিক্ষার সুযোগ প্রদান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়কে বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তকরণ, শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ফাউন্ডেশন' গঠন ইত্যাদি। অর্থ বিভাগে প্রণীত 'সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ' শীর্ষক গবেষণাকর্মের ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে 'সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা, ২০১২'।

স্বাস্থ্য খাত সম্পৃক্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে আছে-নার্সিং ইনস্টিটিউট, কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করা, ৪টি মেডিকেল কলেজ স্থাপন, বিভিন্ন পদে ৪০ হাজার জনবল নিয়োগ, রোগী কল্যাণ তহবিল নীতিমালা প্রণয়ন, উপজেলায় মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার কর্মসূচি চালু করণ, নগর এলাকায় গর্ভবতী মা, হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী, বস্তিবাসী ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে তাদের মধ্যে কার্ড বিতরণ ইত্যাদি।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণে গতিশীলতা আনয়ন

রাজস্ব আহরণকে জোরদার করতে ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে ২০০৯ সালে যেখানে রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ছিল ১০.৮ শতাংশ তা ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রায় ১৩.৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। প্রতি বছর জিডিপি'র ০.৬ শতাংশে হারে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিধিগত সংস্কার, ব্যবস্থাপনাগত উৎকর্ষ সাধন এবং তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে রাজস্ব খাতের আধুনিকায়ন, দেশব্যাপী জরিপ এবং নতুন নতুন কর অফিস খোলার মাধ্যমে নতুন করদাতা চিহ্নিতকরণ, করদাতার সেবার মান বৃদ্ধির জন্য আয়কর নির্ধারণ ও পরিশোধে One stop Service পদ্ধতির প্রবর্তন, জাতীয় পরিচয় পত্রের তথ্যের ভিত্তিতে ই-টিন রেজিস্ট্রেশন, মূল্যসংযোজন কর আইন প্রনয়ন, কর প্রশাসনে স্বচ্ছতা আনয়ন, বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তির ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং এর ক্ষেত্র সম্প্রসারণ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনিস্পন্ন মামলাসমূহ নিস্পত্তির লক্ষ্যে হাইকোর্টে নিবেদিত বেঞ্চ স্থাপন, ASYCUDA World soft-ware স্থাপনের মাধ্যমে শুল্ক প্রশাসনের অটোমেশন এর মত কার্যক্রমসমূহ কর রাজস্ব আহরণে ব্যাপক গতি সঞ্চার করেছে। সঞ্চয় হাতিয়ার গুলোকে বাজারভিত্তিক রাখার ফলে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে প্রাপ্তি বাড়ছে।

সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি

বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বেসরকারি বিনিয়োগের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয়নি। কিন্তু সরকারি বিনিয়োগ ২০০৮-০৯ অর্থবছরের জিডিপি'র ৪.৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৭.৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। উল্লেখ্য, এ বিনিয়োগ প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বেশি (২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রেক্ষিত পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ৬.৯ শতাংশ)। সরকারি বিনিয়োগ বেড়ে যাওয়ায় ২০১২-১৩ অর্থ বছরে জিডিপি'র শতাংশে হিসেবে বিনিয়োগ হয়েছে ২৬.৮ শতাংশ যা এ যাবৎকালের মধ্যে সর্বোচ্চ। বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রবৃদ্ধি সহায়ক কর্মসূচিতে অধিক সম্পদ সঞ্চালন এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গুণগত মানসম্পন্ন প্রকল্পকে অগ্রাধিকার প্রদানে অর্থ বিভাগ কার্যকর ভূমিকা রাখে।

একই সাথে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের উদ্যোগকে সফল করতে বিধিগত কাঠামো প্রনয়ন (বাস্তবায়ন সহায়ক পরিপত্র জারি) এবং আনুষঙ্গিক যাবতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি (অর্থ বিভাগে পিপিপি ইউনিট গঠন, লোকবল নিয়োগ) সম্পন্ন করা হয়। ইতোমধ্যে অর্থ বিভাগ কর্তৃক পিপিপি কারিগরি সহায়তা খাত তহবিল স্কীম ও গাইডলাইন গেজেট আকারে জারি করা হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে এ তহবিলে ৪০ কোটি টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে। পিপিপি'র আওতায় গৃহীত পাইলট প্রকল্পসমূহের মধ্যে রয়েছে হেমোডায়ালাইসিস প্রকল্প, ঢাকা বাইপাস প্রকল্প, হেমায়েতপুর-সিঙ্গাইর-মানিকগঞ্জ প্রকল্প, যাত্রাবাড়ি-সুলতানা কামাল সেতু প্রকল্প, মিরপুর স্যাটেলাইট টাউন ও ঢাকা-মাওয়া ফ্লাইওভার প্রকল্প, অবসর প্রকল্প ইত্যাদি। এ সকল প্রকল্পে কারিগরি সহায়তা প্রদান ও পরামর্শক নিয়োগে অর্থায়নের জন্য উল্লিখিত তহবিল ব্যবহৃত হচ্ছে।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ

দক্ষ ব্যয় ব্যবস্থাপনা এবং রাজস্ব, মুদ্রা ও বিনিময় হার নীতির যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে মূল্যস্ফীতিকে লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি নামিয়ে আনার ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে নভেম্বর ২০১৩ (২০০৫-০৬ ভিত্তি বছর ধরে) এ মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়ে ৬.৬ শতাংশে নেমে আসে। মূল্যস্ফীতি হ্রাসের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি সাধারণ জনগণের ওপর মূল্যস্ফীতির প্রভাব প্রশমনে বিগত পাঁচ বছরে খোলা বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রয়, নিয়মিত বাজার পরিবীক্ষণ, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানি শুল্ক হ্রাস, কৃষি খাতের উৎপাদন বৃদ্ধিতে লক্ষ্যাভিমুখী ভর্তুকি প্রদানের মত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। সরকারি খাতে জাতীয় বেতন স্কেল২০০৯ ঘোষণা ও বাস্তবায়ন করা হয় । সরকারি চাকুরিজীবিদের সন্তানদের জন্য মাসিক শিক্ষা ভাতার প্রবর্তন করা হয়। এছাড়া, ২০১৩-১৪ সালের জুলাই মাস হতে প্রদান করা হচ্ছে শতকরা ২০ ভাগ হারে মহার্ঘ্য ভাতা।

২.০ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

জাতীয় অর্থনীতির দ্রুত ও টেকসই বিকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ সম্পদ যোগান দেয়া অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রধান কাজ। এই বিভাগের অধীনস্ত দুটি বৃহৎ সংস্থা হলো- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এবং জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর। এছাড়া কর আপীলাত ট্রাইবুনাল, ঢাকা এবং কাস্টমস, এক্সসাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইবুনাল, ঢাকা অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণে পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রধান উৎসসমূহ হচ্ছেঃ এনবিআর এর আওতাধীন এবং এনবিআর এর আওতা বহির্ভূত করসমূহ এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাধীন উল্লেখযোগ্য করসমূহের মধ্যে রয়েছে আয়কর, মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক, আবগারি শুল্ক, আমদানি শুল্ক ইত্যাদি। শুল্ক ও কর আদায় করা ছাড়াও শুল্ক-কর আরোপ, আরোপিত বা বিদ্যমান শুল্ক-করের হার পরিবর্তন তথা হ্রাসবৃদ্ধি, যৌক্তিকীকরণ ও উদারীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কাজ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সম্পন্ন করে থাকে।জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এর মাধ্যমে আহরিত সম্পদ সরকারের বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

২.১ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংস্কারমূলক কার্যক্রম

আইন ও বিধি সংস্কার

দেশের দ্রুত ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং পরিবর্তনশীল বিশ্ব প্রেক্ষিত ও জাতীয় আশা-আকাঙ্খাকে বিবেচনায় রেখে ২০০৯ হতে ২০১৩ সময়কালে সরকার জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুশাসনাধীন আইন ও বিধিসমূহ ব্যাপক সংস্কারের মাধ্যমে আধুনিকায়নের কার্যক্রম হাতে নেয় এবং এ প্রক্রিয়া এখনো চলমান রয়েছে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেঃ

মূল্য সংযোজন কর আইন ২০১২ এবং এর আলোকে নতুন মূল্য সংযোজন কর বিধিমালাপ্রণয়ন

১৯৯১ সনে প্রবর্তনের পর হতে গত ২২ বছরে মূল্য সংযোজন কর আইনও এর বিধিবিধানসমূহ বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন/সংশোধনের মাধ্যমে তার আদর্শিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে একটি বিনিয়োগ ও রাজস্ব প্রতিকূল ব্যবস্থায় পর্যবসিত হয়েছিল। এর আমূল পরিবর্তনের দাবী ছিল দীর্ঘদিনের। ২০০৯ সনে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে এ আইন ও বিধিমালার পরিবর্তে একটি যুগোপযোগী মূসক আইন ও বিধিমালা প্রণয়নের পদক্ষেপ নেয় এবং ২০১২ সনের মধ্যেই নতুন মূল্য সংযোজন কর আইন প্রণয়ন সম্পন্ন করে। নতুন এ আইনটিকে আর্ন্তজাতিক আদর্শিক বা তাত্ত্বিক মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা ও দেশীয় অর্থনীতি ও সংস্কৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ করে তৈরি করা হয়েছে। লেনদেনভিত্তিক (Transaction-based) হওয়ায় এবং করের পুনঃপৌনিকতার (Cascading) সম্ভাবনা কম থাকায় এই নতুন আইনের রাজস্ব আয়, উৎপাদন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বিদ্যমান বিনিয়োগের মধ্যে প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণ এবং ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণের ক্ষমতা পূর্বের আইন অপেক্ষা অনেক বেশি। আইনটি ২০১৫ সনের জুলাই হতে সম্পূর্ণ কার্যকর করা হবে। এ লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ৫৬ মিলিয়ন ডলারের সংস্কার বা আধুনিকায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন আছে। আধুনিকায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হলে দেশের রাজস্ব ব্যবস্থায় বড় ধরণের পরিবর্তন আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর পরিবর্তে নতুন আয়কর আইন প্রণয়নের উদ্যোগ

মূল্য সংযোজন কর আইনের ন্যায় ১৯৮৪ সনে প্রণীত আয়কর অধ্যাদেশটিও বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন ও সংশোধনের ফলে স্বকীয়তা হারিয়ে আধুনিক বিশ্বে অনুপযোগী আইনে পরিণত হয়েছে। ক্রমবর্ধনশীল জাতীয় অর্থনীতির ব্যাপক সম্ভাবনার প্রেক্ষাপটে করদাতা বান্ধব পরিবেশ সৃজন, আয়কর ধার্যকরণ ও আদায় এবং অধিক পরিমাণ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে বিদ্যমান আয়কর অধ্যাদেশটি অনুপযোগী বলে বিবেচিত হওয়ায় সরকার আইনটির পরিবর্তে একটি আধুনিক আয়কর আইন প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়।এ লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এর সহযোগিতায় ২০০৯ সালে কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। ইতোমধ্যে আয়কর আইনের খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এর বিভিন্ন দিক নিয়ে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা চলছে। আশা করা যায় ২০১৪-১৫ সনের বাজেট সেশনে এটি আইনে পরিণত হবে।

The Customs Act 1969

ক্রমবর্ধনশীল আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের কাস্টমস্ সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা চলমান আন্তর্জাতিক রীতিনীতির সাথে সংগতিপূর্ণ (Harmonization) ও সহজীকরণের (Simplification) মাধ্যমে উক্ত আনুষ্ঠানিকতা সংক্রান্ত সময় ও ব্যয় (Time and Cost) হ্রাস করে বাণিজ্যকে আরো অধিক প্রতিযোগী ও ভোক্তা স্বার্থবান্ধব করার লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগীদের সহযোগিতায় বিদ্যমান কাস্টমস্ আইনকে আধুনিকায়নের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। আশা করা যায় ২০১৪-১৫ সনের বাজেট অধিবেশনে এটি মহান সংসদে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে।

জনবলের পুনর্বিন্যাস

অভ্যন্তরীণ রাজস্বের প্রায় আশি ভাগ ও কর রাজস্বের প্রায় পঁচানব্বই ভাগ সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও সংগঠন, জনবল, লজিস্টিকস্, আধুনিক প্রযুক্তি (ICT) ব্যবহার ও সক্ষমতার (Capacity) দিক থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দীর্ঘকাল ধরে অবহেলিত ছিল। বিগত দুই দশকের অধিক সময় বিষয়টি তেমন গুরুত্ব পায়নি। ২০০৯ সনে ক্ষমতায় এসেই মহাজোট সরকার এ দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয় এবং শুল্ক ও আয়কর বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের সংগঠন, জনবল ও লজিস্টিক এর আধুনিকায়নসহ আয়তন ও পরিধি প্রায় দ্বিগুণ করে। আয়কর অনুবিভাগের আওতায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে ৪টি নতুন সদস্য পদ, ১৫টি নতুন কর অঞ্চল, ৩৪৬টি নতুন কর সার্কেল সৃষ্টিসহ ৩,৬০৮টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। অনুরূপভাবে শুল্ক ও মূসক অনুবিভাগের আওতায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে ৪টি নতুন সদস্য, ১৪৬টি নতুন সার্কেল, ৫৬টি বিভাগীয় অফিস, ৬টি কমিশনারেট, ২টি আপীলাত ট্রাইব্যুনাল বেঞ্চ গঠন, ২টি কাস্টম হাউস, ১টি বন্ড কমিশনারেট সৃষ্টিসহ ৫,২৪১টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে বিভিন্ন পর্যায়ে মোট ১৪৮টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। একই সাথে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং তার অধঃস্তন দপ্তরসমূহে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া উভয় অনুবিভাগের প্রায় ২,০০০ কর্মকর্তাকে নিয়োগ ও পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সংখ্যার দিক থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে বর্তমানে জনবল সমস্যা তেমন নেই।

শুল্ক ও কর কাঠামোর সংস্কার (প্রযুক্তিগত কৌশলের পরিবর্তন)

বিনিয়োগ ও ব্যবসা প্রসারের জন্য সুষম শুল্ক ও কর কাঠামো গঠনের অপরিহার্যতা বিবেচনায় বিগত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে শুল্ক ও কর কাঠামোর সংস্কারের প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। এর ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার বিদ্যমান মূল্য সংযোজন কর আইনের অনেক অসংগতি যেমন সংকুচিত ভিত্তি মূল্য, ট্যারিফ মূল্য ব্যবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রে রহিত করেছে। আদর্শিক মূসক ব্যবস্থার পরিপন্থী অনেক বিধান বিদ্যমান মূসক আইন ও বিধি হতে বাতিল করে এগুলোকে অধিকতর আধুনিক ও যুগোপযোগী করা হয়েছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত খাতসমূহে মূসক ও সম্পূরক শুল্ক মওকুফ/ রেয়াত সুবিধা প্রদান অব্যাহত রাখা হয়েছে অথবা নতুন করে প্রদান করা হয়েছে। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হিসেবে মূসক ব্যবস্থার সামগ্রিক অটোমেশনের জন্য একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের সামগ্রিক মূসক ব্যবস্থাপনা তথা নিবন্ধন, হিসাবরক্ষণ, মূসক প্রদান, দাখিলপত্র প্রদান, বিচার ব্যবস্থা, আপীল, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ইত্যাদি বর্তমান ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সম্পাদনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। মূসক ব্যবস্থা অটোমেশনের আওতায় একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ডাটা সেন্টার, ডিজাস্টার রিকভারী সেন্টার, ডাটা প্রসেসিং সেন্টার, ট্যাক্স পেয়ার সার্ভিস সেন্টার (Call Centre), মাঠ পর্যায় পর্যন্ত নেট ওয়ার্কিং এবং মূসক দপ্তরসমূহকে কার্যকরভাবে পুনর্গঠন করা হবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে আমাদের দেশে মূসক ব্যবস্থাপনার প্রায় সকল কার্যক্রম ম্যানুয়ালী সম্পাদন করা হয়। বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৫ সালের জুলাই থেকে মূসক নিবন্ধন কার্যকর অনলাইনে সম্পাদন করা হবে এবং ক্রমান্বয়ে অন্যান্য সকল কার্যক্রম ডিসেম্বর, ২০১৫ সালের মধ্যে অনলাইনে সম্পাদন করা হবে। এর ফলে মূসক ফাঁকি প্রতিরোধ করা ও করদাতাদের জরুরি সেবা প্রদান করে দেশে একটি মানসম্মত, আধুনিক ও আদর্শ মূসক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

অনলাইন মূসক রিটার্ণ দাখিলের ব্যবস্থাসহ অটোমেটেড ও কানেকটেড মূসক পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে মূসক ব্যবস্থায় বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে আধুনিক অটোমেশন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ২০১৫ এর মাঝামাঝি সময়ে এ কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়। এতে নন-ফাইলার, শর্ট ফাইলার বা ডিলিনকুয়েন্ট ফাইলারগণ দ্রুত করের আওতায় আসবে এবং করদাতাগণের পক্ষে হয়রানিমুক্ত পরিবেশে কর প্রদান করা সম্ভব হবে।

শুল্ক বিভাগের সংস্কার

গত পাঁচ বছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন কাস্টমস্ বিভাগেও অনেক সংস্কারমূলক কাজ করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ আমদানি-রপ্তানি পণ্যের কাস্টমস্ এ্যাসেসমেন্ট ও ক্লিয়ারেন্স সংক্রান্ত সকল আনুষ্ঠানিকতা সহজীকরণ ও স্বল্পতম সময় এবং খুব কম খরচে হয়রানিমুক্তভাবে তা সম্পন্ন করার জন্য সকল ওয়েব-ভিত্তিক অটোমেশন সিস্টেম তথা ASYCUDA World ব্যবস্থা প্রবর্তন। এতে আধুনিক কাস্টমস্ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত এবং World Customs Organization (WCO) অনুমোদিত অধিকাংশ ব্যবস্থাপনা যেমন- কাস্টমস্ ভ্যালুয়েশন সংক্রান্ত মডিউল, রিস্ক ম্যানেজম্যান্ট মডিউল, পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট সিস্টেম, অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর সিস্টেম, ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইনডো সিস্টেম ইত্যাদিও থাকবে। এসব ব্যবস্থা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন আছে। বিভিন্ন মহলের দাবীর প্রেক্ষিতে এবং কার্যকারিতার যথার্থতা প্রমাণিত না হওয়ায় দীর্ঘ বার বছর পর বাধ্যতামূলক পিএসআই পদ্ধতি বাতিল করা হয়েছে। কাস্টমস্ শুল্ক, আমদানি পর্যায়ের সম্পূরক শুল্ক হার অনেক ক্ষেত্রে হ্রাসপূর্বক যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে। দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মূলধনী যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের শুল্ক হার অনেক ক্ষেত্রে হ্রাস করা হয়েছে। স্থল শুল্ক ষ্টেশনসমূহের অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিসহ পদ্ধতি সহজীকরণ করা হয়েছে।

সমন্বিত অটোমেশনের মাধ্যমে আধুনিকায়ন প্রয়াস

দেশের প্রধান অভ্যন্তরীণ রাজস্ব সংগ্রাহক হিসেবে শুল্ক আবগারি ও মূসক এবং আয়কর বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান ও ব্যবহারের ব্যবস্থা একটি সমন্বিত ব্যবস্থার আওতায় নিশ্চিত করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাধীন সকল দপ্তরে শুল্ক ও কর নির্ণয়, আহরণ, যাচাই ও মনিটরিং এবং তথ্য সংরক্ষণের কাজে কম্পিউটারাইজেশনের উপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এতদুদ্দেশ্যে প্রত্যেক অনুবিভাগ উন্নয়ন সহযোগিদের আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

সার্বিক সংস্কার ও আধুনিকায়ন কার্যক্রম

আইন ও জনবল সংক্রান্ত সংস্কার কার্যক্রম ছাড়াও একটি আধুনিক রাজস্ব প্রশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০০৯-২০১৩ সময়কালে সরকার চলমান আন্তর্জাতিক সেরা অভিজ্ঞতার আলোকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নিয়েছে। যেমন,

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আধুনিকায়ন পরিকল্পনা ২০১১-২০১৬

এটা একটি কৌশলগত পরিকল্পনা দলিল। এতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আধুনিকায়নের কৌশলগত বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে। মহান সংসদ কর্তৃকও এটা অনুমোদিত। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন শুল্ক ও কর ব্যবস্থা আধুনিকায়নে এটা মূল দলিল। বোর্ডের অন্যান্য সকল সংস্কার ও আধুনিকায়ন কার্যক্রম এর আওতায় নেয়া হচ্ছে। উক্ত কৌশলগত পরিকল্পনা দলিলের আওতায় ইতোমধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে সক্ষমতা ও করদাতা সেবা সংক্রান্ত নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ হাতে নেয়া হয়েছে:

- বিদ্যমান করদাতা সনাক্তকরণ নম্বর (TIN) যথাযথকরণ (Cleansing) ও জাতীয় সনাক্তকরণ নম্বর (NID) এর ভিত্তিতে নতুন TIN ও মূসক নিবন্ধন (BIN) প্রদান কার্যক্রম চলছে। এটা সম্পন্ন হলে রাজস্ব প্রশাসনে বড় ধরণের ইতিবাচক পরিবর্তন হবে বলে আশা করা যায়
- কাস্টমস্, মূসক ও আয়কর বিভাগে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা (Alternative Dispute Resolution) প্রবর্তন করা হয়েছে। এতে করদাতাদের সাথে কর বিভাগের দূরত্ব কমে যাবে

- অনলাইন আয়কর রিটার্ণ দাখিলের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে
- আইন ও বিধিতে যথাযথ সংশোধন এনে কর্মকর্তাদের ইচ্ছাধীন (Discretionary) ক্ষমতা হ্রাস করা হয়েছে
- করদাতা সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে করদাতা সহায়তাকরণ কেন্দ্র (Facilitation Centre) স্থাপন করা হয়েছে। এর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে
- করদাতাদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে কর প্রদানে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রতিবছর ঢাকাসহ দেশের অধিকাংশ শহরে করমেলার আয়োজন করা হচ্ছে
- ব্যক্তি করদাতাদের কর প্রদান পদ্ধতি সহজতর করার লক্ষ্যে রিটার্ণ ফরম সহজতর করা হয়েছে
- ব্যক্তি করদাতাদের কর মওকুফ সুবিধার সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে
- কর সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিবছর বিভিন্নভাবে প্রচার ও করদাতা প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি করা হচ্ছে
- বিভিন্ন খাতের বিদ্যমান আয়কর হার অধিকতর যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে
- দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে করছাড় বৃদ্ধি ও যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে

২.২ রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি

জাতীয় রাজস্ববোর্ডের রাজস্ব আদায়

২০০৯ হতে ২০১৩ সন পর্যন্ত বর্তমান সরকারের সময়কালে বাংলাদেশে এনবিআর রাজস্ব আদায় রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছে। এ সময়কালে রাজস্ব আদায় প্রবৃদ্ধি এবং কর রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত স্বাধীনতা উত্তরকালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল। এ সময়কালে আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর আদায়ের হারও ছিল বেশি, যা দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইঙ্গিত প্রদান করে। নিম্নের ছকে ২০০২-০৩ থেকে ২০১২-১৩ সময়ের রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি তুলে ধরা হলো।

সারণি ১: জাতীয় রাজস্ববোর্ডের রাজস্ব আদায়

(বিলিয়ন টাকা)

অর্থবছর	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব আদায়	জি.ডি.পি (বাজার মূল্য)	এনবিআর রাজস্ব ও জি.ডি.পি অনুপাত
১	২	৩	৪
২০০২-০৩	২৩৬.৫	৩,০০৫.৮	৭.৮৭
২০০৩-০৪	২৬১.৯	৩,৩২৯.৭	৭.৮৭
২০০৪-০৫	২৯৯.০১	৩,৭০৭.১	৮.০৭
২০০৫-০৬	৩৪০.০	৪,১৫৭.৩	৮.১৭
২০০৬-০৭	৩৭২.২	৪,৭২৪.৮	৭.৮৮
২০০৭-০৮	৪৭৪.৪	৫,৪৫৮.২	৮.৬৯
২০০৮-০৯	৫২৫.৩	৬,১৪৮.০	৮.৫৪
২০০৯-১০	৬২০.৪	৬,৯৪৩.২	৮.৯৬
২০১০-১১	৭৯৪.০	৭,৯৬৭.০	৯.৯৭
২০১১-১২	৯৫০.৬	৯,১৮১.৮	১০.৩৯
২০১২-১৩	১০৯২.২	১০,৩৭৯.৯	১০.৫২

উৎস: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

২০০২-০৩ অর্থ বছরে আদায়কৃত এনবিআর রাজস্ব ছিল ২৩,৬৫১ কোটি টাকা, যা ২০০৬-০৭ সালে ৩৭,২১৯ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। এক্ষেত্রে বিবেচ্য সময়ে রাজস্বের প্রবৃদ্ধি ছিল বছরে গড়ে ১১.৫ শতাংশ মাত্র। অন্যদিকে ২০০৮-০৯ থেকে ২০১২-১৩ সময়ে রাজস্ব ৫২,৫২৭ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১০৯,২১৭ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। গত পাঁচ বছরে এনবিআর রাজস্বের পরিমাণ দ্বিগুনেরও বেশি (১০৮%) বেড়েছে, এবং বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি ছিল ২১.৬ শতাংশ, যা বিগত জোট সরকারের সময়কার অর্জিত প্রবৃদ্ধির প্রায় দ্বিগুণ। এনবিআর রাজস্বের এই বিস্ময়কর (phenomenal) প্রবৃদ্ধি সরকারের সুষ্ঠু ও সঠিক করনীতি ও ব্যবস্থাপনার ফসল।

অন্যদিকে, ২০০২-০৩ পরবর্তী জিডিপি-এনবিআর রাজস্ব অনুপাত বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০২-০৩ থেকে ২০০৬-০৭ সময়ের এই অনুপাত প্রায় অপরিবর্তিত (৭.৮৭% থেকে ৭.৮৮%) ছিল। বর্তমান সরকার যখন দায়িত্ব নেয় (২০০৮-০৯) তখন জিডিপি-এনবিআর কর অনুপাত ছিল ৮.৫শতাংশ। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে তা বেড়ে ১০.৫ শতাংশ হয়েছে। লক্ষণীয় যে, বর্তমান সরকারের মাত্র পাঁচ বছরে কর-জিডিপি অনুপাত প্রায় ২ শতাংশ বাড়াতে সক্ষম হয়েছে, যা তার পূর্ববর্তী কোন সময়েই সম্ভব হয়নি।

সার্বিক রাজস্ব আদায়

অভ্যন্তরীণ সম্পদ যোগানের প্রধান প্রধান খাতসমূহ হচ্ছেঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবংজাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আওতা বর্হিভূত করসমূহ এবং কর বর্হিভূত রাজস্ব। ২০০২-০৩ অর্থ বছরে মোট রাজস্ব আদায় হয়েছিল জিডিপির ১০.১২ শতাংশ যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে দাঁড়িয়েছে ১২.৪১ শতাংশ। অর্থাৎ মোট রাজস্ব আদায় বর্ণিত সময়ে জিডিপির ২.৩ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০০৩ হতে ২০০৮-০৯ পর্যন্ত সার্বিক রাজস্ব আদায় জিডিপির ১০ থেকে ১১ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল যা বর্তমানে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। চলতি অর্থবছরে এই হার জিডিপির ১৪.১ শতাংশে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০০২-০৩ হতে ২০১২-১৩ অর্থ বছর পর্যন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আদায়ের পাশাপাশি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আওতা বর্হিভূত এবং কর বর্হিভূত রাজস্ব আদয়ের পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট-৯ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

কর আরোপ ও আদায় পরিবেশ

কর আরোপ ও আদায় পরিবেশের পরিবর্তনে বিগত সময়ে অনেক কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ প্রতিবছর ঢাকাসহ সকল বিভাগীয় এবং জেলা শহরে আয়কর মেলার আয়োজন, সর্বোচ্চ কর প্রদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সনাক্ত করণপূর্বক স্বীকৃতি প্রদান, বিভাগীয় শহরে কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র স্থাপন, কর কর্মকর্তাদের প্রণোদনামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা ইত্যাদি।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর অধীন কাস্টমস, মূল্য সংযোজন কর ও আয়কর বিভাগ আমদানিকারক, রপ্তানিকারক ও করদাতাদের উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন পদ্ধতিতে সেবা প্রদান করছে। এসব সেবার কারণে করদাতাদের মধ্যে কর প্রদানের সংস্কৃতির অনেক উন্নতি হয়েছে যা অধিক পরিমাণে রাজস্ব আদায়ে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

২.৩ জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তরের সংস্কারমূলক কার্যক্রম

বাজেট ঘাটতি অর্থায়নে জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের সঞ্চয়পত্র বিক্রয়লব্ধ সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ঘাটতি অর্থায়নের জন্য বৈদেশিক সম্পদের ওপর নির্ভশীলতা হ্রাস এবং অভ্যন্তরীণ ব্যাংক ব্যবস্থার উপর চাপ প্রশমনে জাতীয় সঞ্চয়পত্রের উল্লেখোযাগ্য অবদান রয়েছে। জাতীয় সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে ঘাটতি অর্থায়নের মূল্যস্ফীতি প্রভাবও (Inflationary Impact) কম। এছাড়া, জাতীয় সঞ্চয়পত্র স্কীমে বিনিয়োগের মাধ্যমে মহিলা ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে সামাজিক নিরাপত্তা লাভ করছেন। সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণের জন্য জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর নিম্নোক্ত সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে:

- মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করতে গত ২০০৯-১০ অর্থ বছরের শুরুতে আকর্ষণীয় মুনাফা হারে পরিবার সঞ্চয়পত্র পুনঃপ্রবর্তন করা হয়েছে; যেখানে মাসিকভিত্তিতে মুনাফা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে
- বয়োজ্যেষ্ঠ ও শারীরিক প্রতিবন্ধী বাংলাদেশি (পুরুষ/মহিলা) নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে অধিক মুনাফা সম্বলিত পরিবার সঞ্চয় পত্রে গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখ হতে বিনিয়োগের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে
- গত ১ জুলাই ২০১১ তারিখ হতে ক্রয়কৃত অধিকাংশ সঞ্চয় স্কীমে উৎসে আয়কর কর্তনের হার ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে
- সঞ্চয় স্কীমসমূহকে অধিকতর আকর্ষণীয় করতে এর মুনাফার হার বৃদ্ধি করে যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে
- গত ১ জুলাই ২০১০ তারিখ হতে ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউ. এস. ডলার ইনভেষ্টমেন্ট বন্ড এবং ইউ. এস. ডলার প্রিমিয়াম বন্ড একাধিক মেয়াদের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনঃবিনিয়োগ সুবিধা চালু করা হয়েছে। আবার ইউ. এস. ডলার প্রিমিয়াম বন্ড ও ইউ. এস. ডলার ইনভেষ্টমেন্ট বন্ডের পাশাপাশি একই ধরণের মুনাফার হার ও অন্যান্য সুবিধা সম্বলিত ইউরো এবং পাউন্ড স্টারলিং বন্ড চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে
- তাছাড়া অনিবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের কথা বিবেচনা করে গত ০১ জুলাই ২০১২ তারিখ হতে ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউ. এস. ডলার ইনভেষ্টমেন্ট বন্ড এবং ইউ. এস. ডলার প্রিমিয়াম বন্ড এর বিধিবিধান নিম্নরূপভাবে সংশোধন করে ক্রেতাবান্ধব করা হয়েছে-
  - ✓ ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডের মুনাফার হার বৃদ্ধিপূর্বক যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে। ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডে মৃত্যু ঝুঁকি সুবিধা (Death Risk Benefit) ২.৫ লক্ষ টাকা হতে বাড়িয়ে ৫.০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে
  - ✓ ইউ. ইস. ডলার ইনভেষ্টমেন্ট বন্ডের জন্য প্রিমিয়াম বন্ডের অনুরূপ মৃত্যু ঝুঁকি সুবিধা (Death Risk Benefit) চালু করা হয়েছে
  - ✓ ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডে ৮ কোটি টাকা বা তদূর্ধ্ব অংকের বিনিয়োগকারীদের জন্য সি. আই. পি সুবিধা চালু করা হয়েছে
  - ✓ বৈদেশিক মুদ্রার একাউন্ট (FC Account) ছাড়াও বন্ড ইস্যুর ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে
  - ✓ বাংলাদেশী পাসপোর্টধারী যাতে পাসপোর্টের কপি প্রদান করে এবং বিদেশী পাসপোর্টধারী বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ব্যক্তিগণ যাতে তাদের পাসপোর্টে বাংলাদেশ দূতাবাস হতে পাওয়া æNo Visa Required" সিল-সহ পাসপোর্টের কপি প্রদান করে বন্ড ক্রয় করতে পারে সে ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
  - ✓ বিদেশে অবস্থিত এক্সচেঞ্জ হাউজগুলোর মাধ্যমে বন্ড বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
  - ✓ বন্ড হারিয়ে গেলে বা বিনষ্ট হলে ডুপ্লিকেট বন্ড ইস্যুর সময়সীমা ৬ মাস হতে কমিয়ে ২ মাসে নামিয়ে আনা হয়েছে। পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের বাধ্যবাধকতা পরিবর্তন করে শুধুমাত্র স্থানীয় পুলিশ ষ্টেশনে জিডি করে ডুপ্লিকেট বন্ড ইস্যুর বিধান চালু করা হয়েছে
- অন্যান্য সঞ্চয় স্কীমসমূহকে আরো অধিকতর আকর্ষণীয় করার নিমিত্তে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যা প্রজ্ঞাপন প্রকাশের সাথে সাথে বাস্তবায়ন করা হবেঃ-
  - ✓ মুনাফা প্রদানের ন্যূনতম সময়সীমা ১ বছর হতে কমিয়ে ৬ মাসে নির্ধারণ করা
  - ✓ সঞ্চয়পত্র লিয়েন রেখে ঋণ গ্রহণের সুবিধা পুনঃপ্রবর্তন

- ✓ ৫-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র ও ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক-মেয়াদি হিসাব একাধিক মেয়াদে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনঃবিনিয়োগ সুবিধা চালু
- ✓ ডাক জীবন বীমার প্রিমিয়াম জমা সংক্রান্ত বিধি বিধান সহজীকরণ
- ✓ যে সকল সঞ্চয় স্কীমে বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা একক নামে ৩০ লক্ষ এবং যুগ্ম নামে ৬০ লক্ষ টাকা রয়েছে তা বাড়িয়ে একক নামে ৫০ লক্ষ টাকা এবং যুগ্ম নামে ১ কোটি টাকা উন্নীত করা
- ✓ অকরযোগ্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য গঠিত ভবিষ্য তহবিল সঞ্চয় স্কীমে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি

- ➢ জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তরের সাংগঠনিক অবকাঠামো সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এর প্রয়োজনীয় জনবল বৃদ্ধির পাশাপাশি অত্র পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করার লক্ষ্যে সকল আনুষ্ঠানিকতা সুসম্পন্ন করে প্রজ্ঞাপন প্রকাশের অপেক্ষায় আছে
- ➢ সঞ্চয় স্কীমের বিক্রয়, বিপনন ব্যবস্থা এবং তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থায় আধুনিকায়নের জন্য অটোমেশন ব্যবস্থা চালুর লক্ষ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিতে কার্যক্রম চলছে
- ➢ বিনিয়োগকারীদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তরের জন্য সর্বাধিক তথ্য সমৃদ্ধ একটি ডেডিকেটেড ওয়েব সাইট তৈরি করা হয়েছে
- ➢ বিদ্যমান জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তরের আহরিত সম্পদের বিবরণী

জাতীয় সঞ্চয়পত্র স্কীমের আওতায় আহরিত সম্পদের বিবরণী পরিশিষ্ট-১০ এ তুলে ধরা হয়েছে।

৩.০ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংক ও আর্থিক খাতের অপরিসীম গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে এ এ খাতে অধিকতর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম নিবিড় করার লক্ষ্যে জানুয়ারি, ২০১০-এ 'ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ' প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দেশের আর্থিক খাতের উন্নয়ন এবং শৃঙ্খলা রক্ষায় এ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৩.১ ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্পর্কিত

বর্তমান সরকারের 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নকল্পে বিগত পাঁচ বছর ধরে দেশের অর্থনীতি স্থিতিশীল রাখা ও এর সূচকগুলোর উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোর মূলধন পর্যাপ্ততা কাঠামো শক্তিশালীকরণ, সঞ্চিতি কাঠামো পুনঃনির্ধারণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া ও মডেল শক্তিশালীকরণ, পদ্ধতিগত ঝুঁকি পূর্বানুমান করতে stress testing কৌশল শক্তিশালীকরণ এবং অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়নের উপর যথাযথ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

আইনী সংস্কার

ইতোমধ্যে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর বেশকিছু ধারা সংশোধনক্রমে ব্যাংক কোম্পানী (সংশোধন) আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ শিল্পব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৯, প্রবাসী কল্যাণ আইন, ২০১০, গ্রামীণ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০১২ এবং গ্রামীণ ব্যাংক আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে উন্নীত করার লক্ষ্যে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯ রহিত করে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ সংশোধন করে সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে। মানি লন্ডারিং আইনের আওতায় সম্পৃক্ত অপরাধ হিসেবে বেশকিছু অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (FIU) গঠন করা হয়েছে। অপরদিকে আন্তর্জাতিক রীতি-নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ঋণ শ্রেণিকরণ ও প্রভিশনিং এবং ঋণ পুনঃতফসিল সংক্রান্ত নতুন নীতিমালা প্রবর্তন করা হয়েছে।

অটোমেশন

আইন ও বিধিগত সংস্কারের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং রাষ্ট্র মালিকাধীন ব্যাংকসমূহকে তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক ব্যাংক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যাংকের জনবল কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে আইটি পার্সোনেলদের জন্য নতুন নতুন পদ সৃষ্টি করে জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংককে সত্যিকার অর্থে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ও পেপারলেস প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড় করানোর লক্ষ্যে ব্যাংকিং কার্যক্রম, তথ্য সংগ্রহ, নিয়োগ ও টেন্ডার প্রক্রিয়াকে স্বয়ংক্রিয় করা হয়েছে।একই সাথে দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থাকেও ডিজিটাইজড করতে হাতে নেয়া হয়েছে নানা কার্যক্রম। দেশে একটি দ্রুত, নিরাপদ ও আধুনিক পেমেন্ট সিস্টেম গড়ে তোলার জন্যে অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ ও ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক চালু করা হয়েছে। ঋণ মঞ্জুরি প্রক্রিয়ায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে অনলাইন সিআইবি সেবা চালু করা হয়েছে। ই-ব্যাংকিং ও ই-কমার্স প্রসারে স্থাপন করা হয়েছে ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ। বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারভিশন কৌশলেও আনা হয়েছে পরিবর্তন। সুপারভিশন সংক্রান্ত ইলেকট্রনিক ড্যাশবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে যা সুপারভিশনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

জনবল ব্যবস্থাপনা

বিগত পাঁচ বছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহে ৩০ হাজার ৪০৪ জন জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কর্পোরেটাইজড ব্যাংকসমূহের জন্য স্বতন্ত্র বেতন স্কেল প্রণয়নের বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। তাছাড়া ব্যাংক পরিচালনায় অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগের বিদ্যমান নীতিমালায়ও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা হয়েছে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি সহায়ক কার্যক্রম

অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জাতীয় লক্ষ্য বাস্তবায়নে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী, যারা কখনো ব্যাংকিং সেবা পেতেন না, তাদেরকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনতে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্যে কৃষি, এসএমইসহ উৎপাদনমুখী খাত ও পরিবেশবান্ধব খাতগুলোতে পর্যাপ্ত ঋণের যোগান নিশ্চিত করা হয়েছে। ১ কোটি ৩১ লক্ষেরও বেশি কৃষক ও দরিদ্র মানুষের জন্য ব্যাংক হিসাব খোলার সুযোগ তৈরিসহ সাধারণ মানুষের কাছে দ্রুত ব্যাংকিং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা চালু করা হয়েছে। বর্তমানে এক কোটিরও বেশি মানুষ মোবাইল ব্যাংকিং হিসাব খুলেছে।

৩.২. ব্যাংকিং খাত সম্পর্কিত কতিপয় নির্দেশকের হালনাগাদ পরিসংখ্যান ও তথ্য

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা/ পরিমাণ	মন্তব্য
১	ব্যাংকের সংখ্যা	৫৬	ডিসেম্বর, ২০০৮ তারিখে তফসিলী ব্যাংকের সংখ্যা ছিল ৪৭টি। গত পাঁচ বছরে ৯টি নতুন ব্যাংকের লাইসেন্স দেয়া হয়েছে।
২	শাখার সংখ্যা	৮,৪৮২	ডিসেম্বর, ২০০৮ তারিখে দেশে কার্যরত ব্যাংকের শাখার সংখ্যা ছিল মোট ৬,৮৮৬টি। গত পাঁচ বছরে ১,৫৯৬টি নতুন শাখা খোলা হয়েছে। ব্যাংকের নতুন শাখা খোলার ক্ষেত্রে অন্ততঃ অর্ধেক শাখা পল্লী এলাকায়/গ্রামে খোলার নির্দেশনা রয়েছে। বর্তমানে ব্যাংকের শাখা শহরের (৩,৬৩০টি) চেয়ে গ্রামে (৪,৮৫২টি) বেশি।
৩	ব্যাংক হিসাবের সংখ্যা	৬.১২ কোটি	গত পাঁচ বছরে আমানতকারীদের ব্যাংক হিসাব সংখ্যা ২ কোটি ৩৬ লক্ষ বা ৬৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৬ কোটি ১২ লক্ষে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে ৯৬ লক্ষ ৩৭ হাজার কৃষকের ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে। এছাড়া, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ভাতাভোগীদের জন্যে ২৬ লক্ষ ৯৩ হাজার অসহায় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে ১ লক্ষ ১৪ হাজার, হিজড়া ধর্মীয় ভুরুঙ্গ ব্যক্তি, কর্মসংস্থান কর্মসূচির আওতায় অতি দরিদ্র শ্রমিক, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অনুদানপ্রাপ্ত ভুরুঙ্গ ব্যক্তি ও সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন কর্মীদের জন্যে ৮ লক্ষ ১১ হাজার ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে। এছাড়া, বিনা চার্জে একশ টাকার বিনিময়ে জীবন বীমা গ্রহীতা ও গার্মেন্টস শ্রমিকদের ব্যাংক হিসাব খোলার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।
৪	ব্যাংকের সঞ্চয় কার্যক্রম	৫,৯২,৪৮২ কোটি টাকা	ডিসেম্বর, ২০০৮ তারিখে ব্যাংকগুলোতে মোট সঞ্চয়/আমানতের পরিমাণ ছিল ২,৫২,৭৫৬ কোটি টাকা। গত পাঁচ বছরে তা ৩,৩৯,৩৫২ কোটি বা ১৩৪ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫,৯২,৪৮২ কোটি টাকা।
৫	মোট ঋণ ও আগাম	৪,৫৬,১০৫ কোটি টাকা	ডিসেম্বর, ২০০৮ তারিখে মোট ঋণ ও আগামের পরিমাণ ছিল ২,১১,০৬৫ কোটি টাকা। গত পাঁচ বছরে তা ২,৪৫,০৪০ কোটি টাকা বা ১১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪,৫৬,১০৫ কোটি টাকা।
৬	সরকারি খাতে ঋণ	৮,৫৫৮ কোটি টাকা	
৭	বেসরকারি খাতে ঋণ	৪,৪৭,৫৪৭ কোটি টাকা	

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা/ পরিমাণ	মন্তব্য
৮	বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	১৭.১ বিলিয়ন ডলার	৩০ ডিসেম্বর, ২০০৮ তারিখে রিজার্ভ ছিল ৫.৮ বিলিয়ন ডলার। গত পাঁচ বছরে রিজার্ভ প্রায় তিনগুণ বেড়ে ৩ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে দাঁড়িয়েছে ১৭.২ বিলিয়ন ডলার। ২৩ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রেকর্ড ১৭ বিলিয়ন ডলারের মাইলফলক অতিক্রম করে। ০৬ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে সর্বোচ্চ রিজার্ভ দাঁড়ায় ১৭.৬ বিলিয়ন ডলার। বর্তমান রিজার্ভ দেশের ছয় মাসের আমদানি মূল্য পরিশোধের জন্যে যথেষ্ট। উল্লেখ্য, রিজার্ভের এই স্থিতি দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। ভারত ও পাকিস্তানের অবস্থান যথাক্রমে প্রথম ও তৃতীয়।
৯	মুদ্রামান (গড় ভারিত ডলার-টাকা রেট)	৭৭.৭৫	বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে টাকার মূল্যমান ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং বাজারভিত্তিক তদারকির কারণে বর্তমানে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর মুদ্রার তুলনায় অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল ও শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে।

৩.৩ ব্যাংকিং খাতের ঋণের মোট আগাম ও সেক্টর ভিত্তিক বিভাজন

সারণি ২: খাতভিত্তিক ঋণ বিভাজন

(কোটি টাকায়)

খাত	স্থিতি ডিসেম্বর, ২০০৮	স্থিতি সেপ্টেম্বর, ২০১৩
কৃষি	১২,৫৮৬.৯	২৪,৭৬১.৫
শিল্প	৩৭,১১৮.৩	৫৬,৬৩৭.০
চলতি মূলধনী ঋণ	৪৩,২৪৫.৭	৭১,৩৭৬.৭
রপ্তানি ঋণ	১১,২৩৭.৭	১৩,২৯৪.০
বাণিজ্যিক ঋণ	৬০,৬৫৪.৪	৭৮,২৯৯.০
অন্যান্য	৪৬,২২২.০	২,১১,৭৩৬.৫
মোট	২,১১,০৬৪.৯	৪,৫৬,১০৪.৬

গত পাঁচ বছরে কৃষি খাতে ঋণ কার্যক্রমের গুণগত মান বেড়েছে ও পরিমাণগত বৃদ্ধি ঘটেছে। চলতি অর্থবছরে (২০১৩-১৪) কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৪,৫৯৫ কোটি টাকা। এছাড়া, দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের দারিদ্র্য নিরসনে সনাতনী কৃষির পরিবর্তে উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদনের জন্যে এডিবি'র অর্থায়নে ৩৫০ কোটি টাকার দু'টি তহবিল গঠন করা হয়েছে। অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে (অক্টোবর, ২০১৩ পর্যন্ত) কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ৪,১২২ কোটি টাকা, যা মোট লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ২৮ শতাংশ।

চলতি বছরে (২০১৩-১৪) এসএমই ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৭৪,১৮৭ কোটি টাকা। বছরের প্রথম নয় মাসে (সেপ্টেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত) সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান মিলে ৬২,৪৭৩ কোটি টাকা এসএমই ঋণ বিতরণ করেছে, যা মোট লক্ষ্যমাত্রার ৮৪ শতাংশ। এছাড়া নতুন উদ্যোক্তাদের জন্যে ১০০ কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

৩.৪ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবসায় ও বিশেষ কার্যক্রম

আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর অধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩১টি যার মধ্যে ৩টি সরকারি মালিকানাধীন, ৮টি Joint Venture (দেশি-বিদেশি মালিকানাধীন) এবং ২০টি দেশীয় মালিকানাধীন। সারাদেশে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যরত মোট শাখার সংখ্যা ১৭৫টি। এসব প্রতিষ্ঠান দেশের শিল্প, বাণিজ্য, গৃহায়ণ, পরিবহন, এসএমই, কৃষি ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পদ, দায়, আমানত, ঋণ ও ঋণ শ্রেণিকরণ ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য নিম্নরূপঃ

সারণি ৩: আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পদ, দায়, আমানত, ঋণ ও ঋণ শ্রেণিকরণ

(কোটি টাকায়)

	জুন, ২০১৩ ভিত্তিক
ইক্যুইটি	৬,২২১.৮৫
পরিশোধিত মূলধন	৩,৬২২.৭৪
মোট সম্পদ	৩৭,৮৫১.৭১
আমানত	১৭,৪০৪.১৪
পুঁজি বাজারে বিনিয়োগ	১,২৬৩.০৫
ঋণ ও লিজ	২৭,৩৬১.২১
শ্রেণীকৃত ঋণ ও লিজ	১,৬৮২.২৮
বিরূপ শ্রেণিকৃত ঋণও লিজের হার (NPL)	৬.১৫%

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধনের ভিত্তি সুদৃঢ়করণ এবং তাদের ঋণ ঝুঁকি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ঋণ, সম্পদ-দায়, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নিরাপত্তা এবং মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক ৫টি মুখ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন জারি করা হয়েছে। তাছাড়া, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তদারকি জোরদার করার লক্ষ্যে সম্প্রতি Guidelines on Products and Services, Stress Testing Guidelines, Guidelines on Base Rate System জারি করা হয়েছে।

৩.৫ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য এবং দক্ষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে জুন, ২০১২ পর্যন্ত মোট ৬৪৩টি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে, এর মধ্যে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ৬৭টি প্রতিষ্ঠানকে সনদ প্রদান করা হয়। সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তথ্য আদান-প্রদানের নিমিত্ত ই-রেগুলেটরি সিস্টেম নামে একটি ইনফরমেশন সিস্টেম চালু করা হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেইজ তৈরির লক্ষ্যে এমআরএ কর্তৃক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণের সামগ্রিক চিত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জুন, ২০১২ পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ খাতের মোট ঋণ-স্থিতি প্রায় ২৯ হাজার কোটি টাকা এবং ঋণ আদায়ের হার প্রায় ৯৮ শতাংশ। এই খাতের মোট সঞ্চয় প্রায় ১৯ হাজার কোটি টাকা। অপরদিকে, ২০১০ সালে ঋণ-স্থিতি ছিল ২১ হাজার কোটি টাকা। এই খাতের মোট সঞ্চয় প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতায় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অধীনে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন-যাত্রার মানোন্নয়ন এবং আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পল্লী-কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর মাধ্যমে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম,

সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ) এর মাধ্যমে নতুন জীবন কার্যক্রম, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত গৃহায়ন তহবিল এবং কৃষি ব্যাংকের ঘরে ফেরা কর্মসূচি ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ কর্তৃক আয়বর্ধক কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জুন, ২০১২ পর্যন্ত পিকেএসএফ কর্তৃক ৬৬.৫১ লক্ষ উপকারভোগীর মাঝে মোট ২,৩২০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় ২০০৯ সালে যা ছিল ১,৮১৯ কোটি টাকা। এ ছাড়াও দেশের ১৫টি উপকূলীয় জেলায় বসবাসরত প্রায় ২০ লক্ষ মৎসজীবির আর্থিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং জীবন বীমা কর্পোরেশনের যৌথ উদ্যোগে স্বল্প প্রিমিয়ামের মাধ্যমে বীমা Community based Insurance for Coastal Fishermen- স্কিম চালু করা হয়েছে।

৩.৬ বীমা সম্পর্কিত

আইনী সংস্কার

জাতীয় অর্থনীতিতে বীমা খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ বীমা আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করে। বর্তমানে বিলুপ্ত বীমা অধিদপ্তর তদানীন্তন বীমা আইন, ১৯৩৮ এবং বীমা বিধিমালা, ১৯৫৮ এর আলোকে দেশের বীমা খাত নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করে আসছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বীমা শিল্পের আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের জন্য যুগোপযোগী বীমা আইন, ২০১০ এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ প্রণয়ন করে। এশিয়ান রি-ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশন আইন, ২০১৩ মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন এ্যাক্ট, ১৯৭৩ এর হালনাগাদকরণের কাজও চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। ইতোমধ্যে ১ জন চেয়ারম্যান ও ৪ জন সদস্য সমন্বয়ে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে। নবগঠিত কর্তৃপক্ষ বীমা খাতের সংস্কার ও উন্নয়ন সাধনে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে এবং বীমা আইন ২০১০ যথাযথ প্রয়োগের লক্ষ্যে ৩টি বিধিমালা ও ৮টি প্রবিধানমালা গেজেটে প্রকাশ করেছে; আরো ৩৭টি বিধি/প্রবিধান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০১২ সালে দেশে মোট বীমা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৬২টি; সাধারণ বীমা ৪৪টি, জীবন বীমা ১৮টি, যাদের মধ্যে প্রত্যেক শ্রেণিতে একটি করে সরকারি প্রতিষ্ঠান ছিল। ২০১৩ সালে আরো ২টি সাধারণ ও ৯ টি জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানকে সনদ দেয়া হয়েছে।

ব্যবস্থাপনাগত সংস্কার

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এ খাতের বিরাজমান সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বীমা কোম্পানী কর্তৃক অভিযোগ প্রাপ্তির দুই কার্যদিবসের মধ্যে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা এবং ৫,০০০ টাকার অধিক অংকের লেনদেন চেকের মাধ্যমে সম্পন্ন করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। নন-লাইফ বীমা খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ হলো-টেরিফ রেইট লংঘন বন্ধ করা, সম্পূর্ণ বাকিতে ব্যবসায় বন্ধ করা, পরিচালকদের নিজস্ব কোম্পানিতে ব্যবসায় সীমিত করা, পরিচালকদের যুগপৎ অন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পরিচালক না থাকা, কমিশনের হার নির্ধারণ করা, বীমা এজেন্টদের কমিশনের হার নির্ধারণ করা, জরিপকারীদের মাশুল ও অন্যান্য খরচ পুনঃ নির্ধারণ, সেন্ট্রাল রেটিং কমিটি কর্তৃক ব্যবসায়ের ধরণ ও সীমা নির্ধারণ, বীমা এজেন্ট ব্যতীত অন্য কাউকে প্রিমিয়ামের উপর শতকরা হারে পারিশ্রমিক বা পারিতোষিক প্রদান না করা, নন-লাইফ বীমাকারীর জন্য কমিশন ব্যয়ের (অনধিক ১৫%) সীমা নির্ধারণ ইত্যাদি। জীবন বীমা খাতে কমিশনভিত্তিক জনবল সত্তর পুনর্বিন্যাস করা, কমিশনের হার নির্ধারণ করা, বীমা কোম্পানিসমূহে এ্যাকচুয়ারি নিয়োগে উৎসাহিত করা ইত্যাদি সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও বীমা খাতে স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য ভূসম্পত্তি, ইমারত ক্রয়-বিক্রয়, যানবাহন ক্রয় এর নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশে একচুয়ারিদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রতিটি বীমা কোম্পনিতে একচুয়ারিয়াল বিভাগ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বীমা খাতে কম্পিউটারনির্ভর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে তদারকি জোরদার করতে কর্তৃপক্ষ বীমা কোম্পানিগুলোকে এক ও অভিন্ন সফটওয়্যারের আওতায় নিয়ে আসার জন্য কাজ করছে। এসব কার্যক্রমের ফলে ২০১১ সালে জীবন বীমা কর্পোরেশনসহ সকল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লাইফ ফান্ডের পরিমাণ ১৭,৯১৪.৮৮ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। ২০১১ সালে

বেসরকারি খাতের ৪৩টি ননলাইফ বীমা কোম্পানির সঞ্চিতির পরিমাণ টাকা ১,৩৭০.৬১ কোটি। তাছাড়া সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের রিজার্ভের পরিমাণ ৫৫৪.৩১ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে জিডিপিতে বীমা খাতের অবদান ছিল ৩,২৩১ কোটি টাকা যা ২০১১-১২ অর্থবছরের সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ৩,৭৯৫ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। সার্ক দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য ০৬ ও ০৭ এপ্রিল, ২০১৩ তারিখে ঢাকায় প্রথম সার্ক ইন্স্যুরেন্স রেগুলেটর্স কনফারেন্স, ২০১৩ আয়োজন করা হয়।

জনবল

বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমী বীমা শিল্পে দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতি বছর ২৭/৩০টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনাসহ বীমা সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর ৪/৫টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ পরিচালনা করছে। প্রশিক্ষণ কোর্সের পাশাপাশি একাডেমি বীমা শিল্প বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা করে থাকে। এযাবৎ ৪২৪জন শিক্ষার্থী একাডেমি থেকে বীমার ওপর ডিপ্লোমা অর্জন করেছেন। এ পর্যন্ত বীমা একাডেমি ৭৪৮টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ২৪,৪০০ জনের অধিক প্রশিক্ষণার্থীকে সফলভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। একাডেমি নিজস্ব ডিপ্লোমা কোর্সের পাশাপাশি এসিআইআই (লন্ডন) এবং এ্যাকচুরিয়াল সাইন্স (ইন্ডিয়া) কোর্স পরিচালনা করছে। ইতোমধ্যে ১০জন শিক্ষার্থী একাডেমীর মাধ্যমে ACII অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। এ্যাকচুরিয়াল সাইন্স (ইন্ডিয়া) কোর্সে ৬০জনের অধিক শিক্ষার্থী একাডেমির মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করেছেন। উক্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১২জন একাধিক বিষয়ে ইতোমধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁরা বিভিন্ন বীমা কোম্পানিতে কর্মরত রয়েছেন। এছাড়াও বীমা বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মালয়েশিয়া এবং ভারতের সাথে অংশিদারিত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.৭ পুঁজিবাজার সংক্রান্ত

পুঁজিবাজার পরিস্থিতি

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার সময় ০১ জানুয়ারি, ২০০৯ তারিখে ডিএসই সাধারণ সূচক ছিল ২৮০৭.৬১। পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক সূচকসমূহের অগ্রগতির ধারাবাহিকতা পুঁজিবাজারেও পরিলক্ষিত হয়। সরকারের পুঁজিবাজারবান্ধব বিভিন্ন সিদ্ধান্তের ফলে ২০১০ সালের প্রথম থেকে স্টক এক্সচেঞ্জ এর সাধারণ মূল্য সূচক এবং দৈনিক লেনদেন উভয়ই বৃদ্ধি পায়। ২০১০ সালের শুরু থেকে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) কর্তৃক নানামুখী পরামর্শ এবং সতর্কতামূলক বিজ্ঞপ্তি অগ্রাহ্য করে বিনিয়োগকারীগণ বিপুল সংখ্যায় ও বর্ধিত পরিমাণে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখে। ফলশ্রুতিতে নভেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত শেয়ারের সাধারণ মূল্য সূচক বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাশাপাশি Major Correction এর আশঙ্কা বাড়তে থাকে। সে সাথে বাজারে বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে নতুন বিনিয়োগকারীগণ অত্যধিক ঝুঁকির মধ্যে গুজব ও জনশ্রুতি তাড়িত হয়ে অধিক মার্জিন ঋণ নিয়ে বিনিয়োগে আকৃষ্ট হতে থাকে। শেয়ারের বিনিয়োগ একটি সুপরিকল্পিত, সুচিন্তিত, বিশ্লেষণধর্মী, কৌশলদীপ্ত এবং সংযমনির্ভর বিনিয়োগ। কিন্তু অধিকাংশ বিনিয়োগকারী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মৌলিক নির্দেশকসমূহকে অবহেলা করে শেয়ারে বিনিয়োগ করতে শুরু করেন।

পরবর্তীতে শেয়ারের মূল্যসূচক অতিমাত্রায় বৃদ্ধির ফলে জানুয়ারি, ২০১১ থেকে মূল্য সংশোধন শুরু হয় এবং সাধারণ মূল্যসূচক অতিমাত্রায় হ্রাস পেতে থাকে। জানুয়ারি, ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত সূচকের পরিবর্তন হয় ৫৪৮ শতাংশ। এ সময় বাজার মূলধন বৃদ্ধি পায় ২৩৫.১ শতাংশে। জানুয়ারি, ২০১১ থেকে ২৯ ডিসেম্বর, ২০১১ সময়ের মধ্যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সাধারণ মূল্যসূচক ও বাজার মূলধন হ্রাস পায় যথাক্রমে ৩০৪৭ পয়েন্ট ও ২৫.৫২ শতাংশে। জানুয়ারি, ২০১২ থেকে ২০ নভেম্বর, ২০১৩ সময়কালে সাধারণ মূল্য সূচকের পরিবর্তন স্থিতিশীল থাকে এবং এ সময় বাজার মূলধন ০.৬৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

পুঁজি সরবরাহ

২০০১-২০০২ অর্থ বছর থেকে এখন পর্যন্ত ১,৪৯১টি কোম্পানির ৮২,১৬৬.৮২ কোটি টাকা। আইপিও, আরপিও, রাইট ইস্যু, ক্যাপিটাল রেইজ (পাবলিক ব্যতীত) ডাইরেক্ট লিস্টিং, বন্ড পুঁজি উত্তোলনের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। বিগত পাঁচ বছরে[১] ৯৪টি কোম্পানিকে ৫৮,২৮৩.৮ কোটি টাকা পুঁজি উত্তোলনের অনুমোদন দেয়া হয়।

দণ্ড/ জরিমানা

জানুয়ারি, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৩ সময়কালে ইস্যুয়ার কোম্পানির বিরুদ্ধে ৩৬০টি, স্টক ব্রোকার/ স্টক ডিলার এর বিরুদ্ধে ২২৭টি, মার্চেন্ট ব্যাংকার এর বিরুদ্ধে ৪টি, সিএ ফার্মের বিরুদ্ধে ৮টি, ক্রেডিট রেটিং কোম্পানির বিরুদ্ধে ২টি, অনুমোদিত প্রতিনিধির বিরুদ্ধে ২টি এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে ৪৮টি, সর্বমোট ৬৫১টি এনফোর্সমেন্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি

জানুয়ারি, ২০০৯ হতে নভেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত সময়কালে মোট ৯৫টি নতুন সিকিউরিটিজ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড-এ তালিকাভুক্ত হয়েছে।

সংস্কার কার্যক্রম

পুঁজিবাজারের স্বার্থে ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শেয়ারের সরবরাহ বৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর সংখ্যা বৃদ্ধিসহ পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি পুঁজিবাজারে দীর্ঘমেয়াদে স্থিতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নিম্নোক্ত সংস্কার কার্যাবলী (উল্লেখযোগ্য) সম্পন্ন করেছে:

সাধারণ সংস্কারসমূহ

- শেয়ারবাজারে কারচুপি ও অনিয়ম চিহ্নিত করার মাধ্যমে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে এবং বাজার পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়া জোরদার করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে আন্তর্জাতিক মানের সার্ভেইল্যান্স সফটওয়ার (Surveillance Software) স্থাপন
- দেশের পুঁজিবাজারের উন্নয়ন এবং বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে ১০ বছরের জন্য মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন
- ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের আওতায় স্টক-ব্রোকার,ডিলার ও মার্চেন্ট ব্যাংকসমূহের মার্জিন ও নন-মার্জিন ঋণ হিসাব (বিও), উভয় ক্ষেত্রে চিহ্নিত ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য ৩০ জুন, ২০১২ থেকে ৩০ জুন, ২০১৪ সময়কালে ইস্যুকৃত সকল পাবলিক ইস্যুতে ২০% কোটা সংরক্ষণ
- পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার ৯ শত কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। ইতোমধ্যে ৩০০ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে, যার পুনঃ অর্থায়ন কার্যক্রম চলছে
- বর্তমান সরকারের সময়কালে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অব সিকিউরিটিজ কমিশনস (IOSCO) এর সকল চাহিদা ও শর্তাবলী পরিপালন করেছে। আশা করা যায়- অচিরেই কমিশন IOSCO'র "Appendix A"তে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে।

আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন/সংশোধন

- এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ প্রণয়ন
- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ২০১৩ প্রণয়ন
- সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অধ্যাদেশ, ১৯৬৯ সংশোধন

---

[১] জানুয়ারি ২০০৯ হতে ২৫ নভেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত

- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন(প্রাইভেট প্লেসমেন্ট অব ডেট সিকিউরিটিজ) রুলস, ২০১২ প্রণয়ন
- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (পাবলিক ইস্যু) রুলস, ২০০৬ সংশোধন
- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ সংশোধন
- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ সংশোধন
- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (রাইট ইস্যু) রুলস, ২০০৬ সংশোধন
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (রিসার্চ এনালাইসিস) বিধি, ২০১৩ প্রণয়ন
- সরকারি মালিকাধীন কোম্পানিসমূহের সম্পদ এবং দায় পুনর্মূল্যায়নের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন
- আইপিওতে আবেদনকৃত সরকারি-বেসরকারি কোম্পানির সম্পদ মূল্যায়নের জন্য আরো একটি নীতিমালা প্রণয়ন

দেশে সুষ্ঠু বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টি, অর্থনীতিকে ভারসাম্যপূর্ণ গতিময়তা প্রদান ও উচ্চতর প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সুদৃঢ় ও উন্নত ব্যাংক বীমা ও আর্থিক পরিসেবা অপরিহার্য। সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং টেকসই উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন প্রক্রিয়ায় আর্থিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বিধায় সরকারের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটিসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ নিরলস প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে।

০.৪ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বৈদেশিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম বিষয়ক নীতি প্রণয়ন,উক্ত বিষয়ে সুপারিশ প্রদান এবং দেশের উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনায় আর্থিক ঘাটতি পূরণের জন্য বৈদেশিক সহায়তা সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করে থাকে। বৈদেশিক সহায়তা সংগ্রহ ছাড়াও এই বিভাগ ঋণ প্রোফাইল ও বাজেট তৈরি,ঋণ পরিশোধ,ঋণ হিসাবসমূহ সংরক্ষণ এবং সার্বিক বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনা করে থাকে।অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে বৈদেশিক সাহায্যের বাজেট ও হিসাব (ফাবা)। বৈদেশিক সাহায্যের বাজেট এবং হিসাব বিষয়ক কার্যক্রম বহুগুণে বৃদ্ধি পাওয়ায় অধিশাখার স্থলে বৈদেশিক সাহায্যের বাজেট ও হিসাব অনুবিভাগ নামে নতুন একটি অনুবিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে। ইআরডির নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৭৮ হালনাগাদপূর্বক নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৩ অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং তা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ 'Flow of External Resources of Bangladesh' [1]নামে বৈদেশিক সহায়তার তথ্য সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রকাশনা নিয়মিত ভাবে প্রকাশ করে আসছে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত বৈদেশিক ঋণ ও অনুদানের প্রায় সকল তথ্য এ প্রকাশনার সন্নিবেশিত হয়। এছাড়াও বৈদেশিক সাহায্যের গতি প্রকৃতির বিশ্লেষণ, বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনা এবং বৈদেশিক ঋণের ব্যবহার এ প্রকাশনার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়যা বৈদেশিক সহায়তা সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা দেয়।বিগত পাঁচ বছরে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে রয়েছে:

৪.১ যৌথ সহযোগিতা কৌশলপত্র (Joint Cooperation Strategy-JCS) প্রণয়ন

বৈদেশিক সহায়তার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশসহ ১২৪টি দেশ ও দাতাসংস্থা ২০০৫ সালে প্যারিস ঘোষণায় স্বাক্ষর করে। এর অনুবৃত্তিক্রমে ২০০৮ সনে ঘানার রাজধানী আক্রায় আয়োজিত তৃতীয় উচ্চ পর্যায়ের ফোরামে (HLF-3) এবং দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে ৪র্থ উচ্চ পর্যায়ের ফোরামে (HLF-4) বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত ২ জুন, ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ সরকার এবং ১৮টি উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থার মধ্যে যৌথ সহযোগিতা কৌশলপত্র (Joint Cooperation Strategy-JCS) স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরদাতা উন্নয়ন সহযোগীরা হচ্ছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ডেনমার্ক, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জার্মানি, ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, জাপান, প্রজাতন্ত্রী কোরিয়া, নেদারল্যান্ড, নরওয়ে, স্পেন, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, জাতিসংঘ, যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্ব ব্যাংক। মূলতঃ বৈদেশিক সাহায্যের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ তথা প্যারিস ঘোষণা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশে কর্মরত উন্নয়ন সহযোগীগণ কর্তৃক যৌথভাবে এ কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়। সরকারের নীতি, কৌশল, প্রাধিকার ও কর্মপদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগীদেরকে দিক-নির্দেশনা প্রদান জেসিএস প্রণয়ন ও স্বাক্ষরের মুখ্য উদ্দেশ্য।

যৌথ সহযোগিতা কৌশলপত্র স্বাক্ষরের ফলে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পক্ষের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন এবং বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। বর্তমানে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব Global Partnership for Effective Development Co-operation এর স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য হিসেবে এশীয় অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করছেন। তিনি International Aid Transparency Initiative-এর ভাইস-চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশলপত্র এবং বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১ (Vision 2021) বাস্তবায়নে এ কৌশলপত্র উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে মর্মে আশা করা হচ্ছে। বর্তমানে যৌথ সহযোগিতা কৌশলপত্র ২০১২-১৪ (Joint Cooperation Strategy 2012-14) বাস্তবায়নাধীন আছে।

---

[1] www.erd.gov.bd

৪.২ বৈদেশিক সহায়তা

বৈদেশিক সাহায্য ছাড়করণ (Disbursement of Foreign Aid)

২০১২-১৩ অর্থ বছর শেষে ছাড়যোগ্য বৈদেশিক সাহায্যের (foreign aid in the pipe line) পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১৬.৫৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (provisional)। এর মধ্যে ২০১১-১২ এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরেই মোট ১০.৬৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক সাহায্য পাইপ লাইনে যুক্ত হয়েছে যা আগামী ৪/৫ বছরের মধ্যে ছাড় হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে বৈদেশিক সাহায্যের ডিসবার্সমেন্ট সরাসরি প্রকল্প বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত বিধায় প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মদক্ষতার ওপর ডিসবার্সমেন্ট বহুলাংশে নির্ভর করে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে মোট বৈদেশিক সাহায্য ছাড়ের পরিমাণ ২,৭৭২.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মোট ছাড়কৃত বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে অনুদান ৭০৮.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ঋণ ২,০৬৩.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আলোচ্য ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বৈদেশিক সাহায্যের ডিসবার্সমেন্টের লক্ষ্যমাত্রা (সংশোধিত) ছিল ২,৬৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার বিপরীতে ১০৩.৩ শতাংশ ছাড় হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ছাড়কৃত বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে ১,৮৪৫.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বহুপাক্ষিক এবং ৯২৬.৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দ্বি-পাক্ষিক উৎস হতে পাওয়া গিয়েছে। ২০০১-০২ হতে ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত বৈদেশিক সাহায্যের অঙ্গীকার ও ছাড় বিষয়ক তথ্য পরিশিষ্ট-৬ এ সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

চিত্র ২: ২০১২-১৩ অর্থবছরে ছাড়কৃত বৈদেশিক সহায়তার মধ্যে অনুদান ও ঋণ এর হার

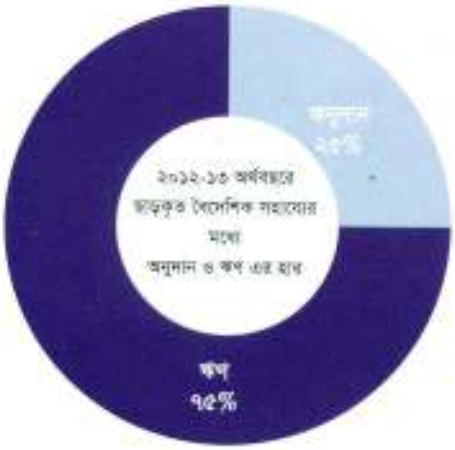

সূত্র: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

বৈদেশিক সাহায্য সংগ্রহ (Foreign Aid Mobilization)

বৈদেশিক সাহায্য সংগ্রহ কার্যক্রমের আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ বছরে মোট ৫,৯৩৫.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে (Commitment)। এর মধ্যে অনুদান (grant) ও ঋণ (loan) এরপরিমাণ যথাক্রমে ৬২৪.৮ ও ৫,৩১০.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বৈদেশিক সাহায্যের কমিটমেন্টের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল ৬,০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার বিপরীতে কমিটমেন্ট অর্জিত হয়েছে ৯৮.৯ শতাংশ। বৈদেশিক সাহায্যের মোট কমিটমেন্টের বেশিরভাগ বহুপাক্ষিক (Multilateral) সংস্থা হতে পাওয়া গিয়েছে। স্বাধীনতা উত্তরকালে ২০১২-১৩অর্থ বছরে ৫,৯৩৫.০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সর্বোচ্চ কমিটমেন্ট অর্জিত হয়েছে।২০১২-১৩অর্থ বছরে বৈদেশিক সাহায্যের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে মোট ১০৮ টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে যার মধ্যে অনুদান চুক্তি ৬৫ টি এবং ঋণ চুক্তি ৪৩টি।

চিত্র ৩: উৎস অনুযায়ী কমিটমেন্টের হার (২০১২-১৩)

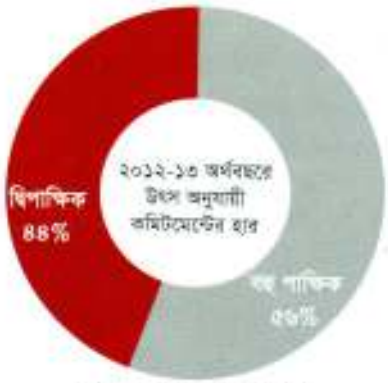

সূত্র: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

৪.৩ বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনা (External Debt Management)

বৈদেশিক সাহায্যের খাত

বাংলাদেশে সাধারণত পণ্য সাহায্য, খাদ্য সাহায্য, প্রকল্প সাহায্য ও বাজেট সাপোর্ট হিসেবে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যায়। ১৯৭২-৭৩ সালে পণ্য সাহায্য, খাদ্য সাহায্য ও প্রকল্প সাহায্য এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫০.৮, ৪৭.৯ এবং ১.৩ শতাংশ। বর্তমানে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ০.০, ০.৭এবং ৯৯.৩ শতাংশ।

চিত্র ৪: ছাড়কৃত বৈদেশিক সহায়তার খাতভিত্তিক পরিমাণ

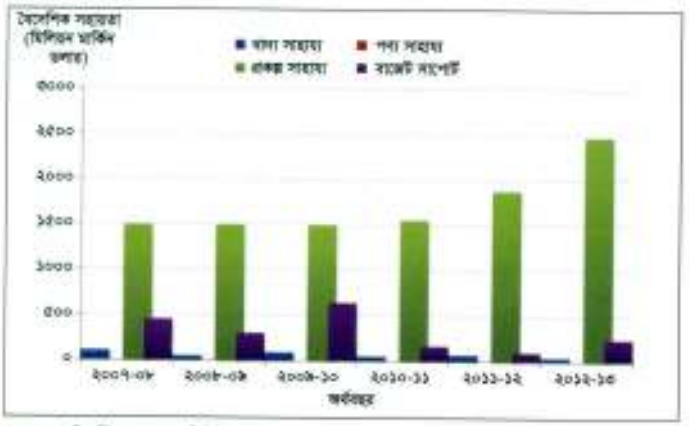

সূত্র: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

বিগত ২০০৭-০৮ অর্থ বছর হতে বাজেট সাপোর্ট হিসেবেও বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরের ছাড়কৃত বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে খাদ্য সাহায্য, প্রকল্প সাহায্য ও বাজেট সাপোর্ট এর পরিমাণ যথাক্রমে ৫০.২, ২,৪৭১.৮ ও ২৫০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিগত কয়েক বছরের ন্যায় ২০১২-১৩ অর্থ বছরেও কোন পণ্য সাহায্য ছাড় হয়নি। ২০১২-১৩ অর্থ বছরসহ বিগত কয়েকটি অর্থ বছরের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ডিসবার্সমেন্ট সম্পর্কিত তথ্য লেখচিত্র-৪ এ উপস্থাপন করা হল।

ঋণের প্রকৃতি ও স্থিতি

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ পাবলিক সেক্টরের বৈদেশিক ঋণের (সরকারি অথবা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত দায় (guaranteed by government) ব্যবস্থাপনা করে থাকে। ঋণ ব্যবস্থাপনার এ কাজটি সুষ্ঠ ও সুচারুভাবে করার জন্য এ বিভাগে ১৯৯২ সাল হতে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সফটওয়্যার Debt Management Financial Analysis System (DMFAS) ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের সক্ষমতা বিশ্বমানে উন্নীত হয়েছে।

চিত্র ৫: অর্থবছরের শেষ দিনে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণের স্থিতি

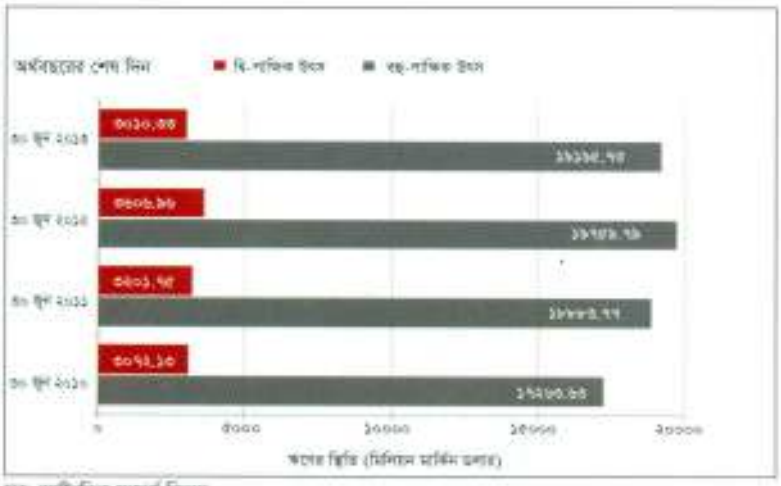

সূত্র: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

পাবলিক সেক্টরের ঋণের সিংহভাগ মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ (Medium and Long Term Debt)। সাধারণত মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ নমনীয় (concessional) প্রকৃতির হয়ে থাকে। DMFAS এর ডাটা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে বাংলাদেশের গৃহীত ঋণ পরিশোধের গড় মেয়াদ (average maturity period) ৩৪ বছর, যার মধ্যে গড়ে ৯ বছর হলো grace period. বিগত কয়েক অর্থ বছরের সর্বশেষ দিনে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণের স্থিতির পরিমাণ উৎস অনুযায়ী (দ্বি-পাক্ষিক এবং বহু-পাক্ষিক) লেখচিত্র-৫ এ দেখানো হল।

ঋণ পরিশোধ (Debt Servicing)

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ পাবলিক সেক্টর ঋণের মধ্যে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণের পরিশোধ কার্যক্রম পরিচালনা করে। ২০১২-১৩অর্থ বছরে পাবলিক সেক্টরে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি বৈদেশিক ঋণের বিপরীতে সর্বমোট ১,১২১.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমতুল্য ৮,৮১৫ কোটি টাকা বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের পরিশোধ করা হয়েছে। যার মধ্যে আসল ৯১৯.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমতুল্য ৭,২৫০ কোটি টাকা এবং সুদ ২০২.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমতুল্য ১,৫৬৫ কোটি টাকা। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে আসল বাবদ ৯৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমতুল্য ৭,৯০৫ কোটি টাকা ও সুদ বাবদ ২১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমতুল্য ১,৭২৫ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ ছিল।

চিত্র ৬: বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ

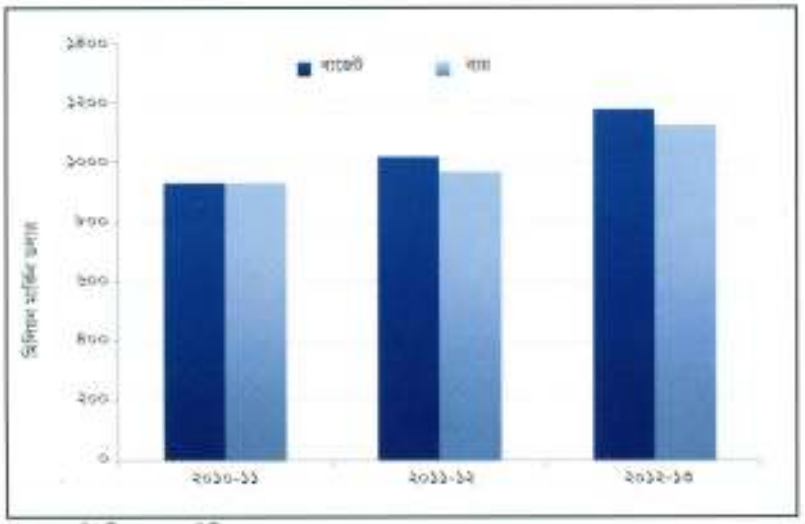

সূত্র: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

অর্থাৎ বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ কার্যক্রম প্রাক্কলিত বাজেট সীমার মধ্যেই ছিল। ২০১০-১১ অর্থ বছরে বাজেট ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৯২৯ ও ৯২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০১১-১২ অর্থ বছরে বাজেট ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১,০১৫ ও ৯৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিগত তিনটি অর্থ-বছরের বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের বাজেট ও প্রকৃত ব্যয়ের তথ্য লেখচিত্র-৬ এ দেখানো হল। উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতার পর থেকে এ যাবৎ বাংলাদেশ যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হয়েছে।এমনকি ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে কিস্তি পুনঃতফসিলকরণের জন্য বাংলাদেশের কখনো আবেদন করারও প্রয়োজন হয়নি। ২০০১-০২ হতে ২০১৩-১৪ অর্থ বছর পর্যন্ত বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের তথ্য পরিশিষ্ট-৭ এ সংযোজন করা হলো।

ঋণ ধারণ ক্ষমতা (Debt Sustainability)

বৈদেশিক ঋণের ধারণক্ষমতা নির্ণিত হয় কতিপয় সূচকের (indicator) ভিত্তিতে। এর মধ্যে অন্যতম ও অধিক প্রচলিত সূচকসমূহ হচ্ছে বৈদেশিক ঋণের স্থিতি এবং বৈদেশিক ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধের সঙ্গে দেশের জিডিপি, রপ্তানি আয়, রাজস্ব আয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ। এক্ষেত্রে বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য ঋণের ধারণক্ষমতা সুস্থিতি সূচকের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করেছে। নিম্নে ২০০৮-০৯ থেকে ২০১২-১৩অর্থ বছরে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের ধারণক্ষমতার সুস্থিতি সূচকের তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করা হলঃ

সারণি ৪: পাবলিক সেক্টর বৈদেশিক ঋণের সূচক

সূচক	বাংলাদেশের পাবলিক সেক্টর বৈদেশিক ঋণের সূচক					বিশ্ব ব্যাংক/আইএমএফ কর্তৃক নির্ধারিত ঋণ ধারণ ক্ষমতার সুস্থিতি সূচকের সর্বোচ্চ হার
	২০১২-১৩	২০১১-১২	২০১০-১১	২০০৯-১০	২০০৮-০৯	
বৈদেশিক ঋণের মোট স্থিতি জিডিপি তুলনায়	১৮.৯৬%	২০.১০%	২২.৩০%	২১.৪০%	২৪.৪০%	৪০%
পণ্য ও সেবা রপ্তানি আয়ের তুলনায়	৫৬.৩০%	৫৯.১০%	৬৩.৫০%	৭২.৩০%	৮০.৫০%	১৫০%
বৈদেশিক ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধ						
পণ্য ও সেবা রপ্তানি আয়ের তুলনায়	৮.৭৪%	৭.০১%	৪.৯০%	৫.৭০%	৬.৪০%	২০%
রাজস্ব আয়ের তুলনায়	২৩.৭২%	১৯.৩৯%	১৫.০৪%	১৪.৭৮%	১৭.৩৫%	৩০%

উপরের সূচক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের ধারণক্ষমতা সর্বোচ্চ সুস্থিতি সীমার অনেক নিচে ছিল। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বিপিসি বৈদেশিক ঋণের আসল বাবদ ২,৪৩০.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও সুদ বাবদ ৬৯.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিশোধ করেছে যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় অনেক বেশি। এ কারণে পণ্য ও সেবা রপ্তানি আয় এবং রাজস্ব আয়ের তুলনায় বৈদেশিক ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধের হার গত বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে সার্বিক এ সূচক হতে স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের ধারণ ক্ষমতা সন্তোষজনক পর্যায়ে আছে। ঋণমান নির্ণয়কারী (credit rating) প্রতিষ্ঠান যথাঃ Moody's Investors Service (Moody's) এবং Standard and Poor's (S&P)-এর প্রকাশিত পর্যবেক্ষণেও তা প্রতিফলিত হয়েছে। উভয় প্রতিষ্ঠানই তাদের রিপোর্টে বাংলাদেশকে পর পর তিন বছর একই সার্বভৌম ঋণমান তালিকায় রেখেছে। এ রেটিং তালিকায় Moody's এবং S&P বাংলাদেশকে যথাক্রমে Ba3 ও BB- মান প্রদান করে বাংলাদেশের ঋণমান পরিস্থিতিকে স্থিতিশীল (stable) হিসাবে আখ্যায়িত করেছে।

এনজিও কর্তৃক প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্য

বেসরকারি সাহায্য সংস্থাসমূহের মাধ্যমে প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যের হিসাব সংরক্ষণ না করলেও আর্থিক বছর শেষে এনজিও ব্যুরো হতে প্রাপ্ত মোট সাহায্যের হিসাব ইআরডি সংরক্ষণ করে। এনজিও ব্যুরোর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য পরিশিষ্ট-৮ তে সংযোজন করা হলো।

পরিশিষ্ট-১

খাতভিত্তিক মোট ব্যয়

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	জনসেবা ও জন শৃংখলা	স্থানীয় সরকার	শিক্ষা, প্রযুক্তি ও স্বাস্থ্য	সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ	জ্বালানি ও বিদ্যুৎ	পরিবহন ও যোগাযোগ	কৃষি	প্রতিরক্ষা	সুদ	অন্যান্য	মোট বাজেট
২০০১-০২	৫,৩৭০	৩,৪৩১	৮,২২২	১,৭৫৯	১,৯৩২	৫,৫২১	২,৫৩৩	৩,৬৪০	৪,৯৪৯	৮৪৫	৩৮,২০২
	(১৪.১)	(৯.০)	(২১.৫)	(৪.৬)	(৫.১)	(১৪.৫)	(৬.৬)	(৯.৫)	(১৩.০)	(২.২)	
২০০২-০৩	৬,৩৮৩	৩,৩৭৯	৮,৭০১	১,৯৭৯	২,৭৫৭	৫,৯৭১	২,৩৫৪	৩,৬১০	৫,৩৬৯	১১২	৪০,৯১৫
	(১৫.৬)	(৮.৩)	(২১.৩)	(৪.৮)	(৬.৭)	(১৪.৬)	(৫.৮)	(৮.৮)	(১৩.১)	(০.৩)	
২০০৩-০৪	৬,৬০৯	৪,৫৩১	৮,৭৭১	২৪৪৯	৩,৭৫৮	৫,১৬৩	২,৫৬৪	৩,৮৭৯	৫,৭৬৯	১৮৭৬	৪৫,৩৬৯
	(১৪.৬)	(১০.০)	(১৯.৩)	(৫.৪)	(৮.৩)	(১১.৪)	(৫.৭)	(৮.৫)	(১২.৭)	(৪.১)	
২০০৪-০৫	৭,৭৫৯	৫,৫২০	৮,৯২৮	৩০৬৬	৩,৯১২	৬,৬২৫	৩,৯৩০	৪,৫০৬	৬,৮৪২	৬৬৭	৫১,৭৫৫
	(১৫.০)	(১০.৭)	(১৭.৩)	(৫.৯)	(৭.৬)	(১২.৮)	(৭.৬)	(৮.৭)	(১৩.২)	(১.৩)	
২০০৫-০৬	৮,৬১১	৫,২৬৫	১১,৫১৯	২৫০৫	৩,৮১১	৫,২০৬	৪,৩৫৬	৪,৪২৬	৭,৮৯৪	২,০৩৮	৫৫,৬৩১
	(১৫.৫)	(৯.৫)	(২০.৭)	(৪.৫)	(৬.৯)	(৯.৪)	(৭.৮)	(৮.০)	(১৪.২)	(৩.৭)	
২০০৬-০৭	৯,৪৩৫	৬,৫৯৩	১৪,২৪০	২৯৭৯	২,৮৮৮	৫,৩০৫	৪,৯৪৯	৬,৩১৯	১০,৫০৮	৯৩৪	৬৪,১৫০
	(১৪.৭)	(১০.৩)	(২২.২)	(৪.৬)	(৪.৫)	(৮.৩)	(৭.৭)	(৯.৯)	(১৬.৪)	(১.৫)	
২০০৭-০৮	১২,৭৫২	৬,১৫৪	১৫,৪৬৪	৪২৮২	২,৮৬২	৫,৩৯৮	৮,৪৭৬	৬,৭৮৬	১৩,৭৩৮	১৪,৯২৫	৯০,৮১৭
	(১৪.০)	(৬.৮)	(১৭.০)	(৪.৭)	(৩.২)	(৫.৯)	(৯.৩)	(৭.৫)	(১৫.১)	(১৬.৪)	
২০০৮-০৯	১২,৫৭০	৬,৯০৪	১৭,১৯৯	৯২৫৮	২,৫৫০	৪,৩৭৮	৯,৫৬০	৭,১৫৬	১৫,৩৫৮	৪,৩৮৩	৮৯,৩১৬
	(১৪.১)	(৭.৭)	(১৯.৩)	(১০.৪)	(২.৯)	(৪.৯)	(১০.৭)	(৮.০)	(১৭.২)	(৪.৯)	
২০০৯-১০	১৪,৮৩২	৮,৪৬০	২২,১৭৫	৮২০৮	৩,৪৬৯	৬,৬২৩	১১,১৪৭	৮,৭৫৯	১৪,৮৬৮	২,৯৭৫	১,০১,৫১৬
	(১৪.৬)	(৮.৩)	(২১.৮)	(৮.১)	(৩.৪)	(৬.৫)	(১১.০)	(৮.৬)	(১৪.৬)	(২.৯)	
২০১০-১১	১৫,৯০০	১০,২০৬	২৬,০৯১	৯০৫৩	৭,২৩৩	৭০৪৯	১২,৯৫৭	১১,১২৫	১৫,৬৩৭	১৩,০৩৫	১,২৮,২৮৬
	(১২.৪)	(৮.০)	(২০.৩)	(৭.১)	(৫.৬)	(৫.৫)	(১০.১)	(৮.৭)	(১২.২)	(১০.২)	
২০১১-১২	১৯,৮১০	১১,০৫০	২৬,৭৭৪	১০৩২২	৭,৯৬৯	৯,৪৫৫	১৪,৬৭১	১২,২৩০	২০,৩৫১	১৯,৮১০	১,৫২,৪৪২
	(১৩.০)	(৭.২)	(১৭.৬)	(৬.৮)	(৫.২)	(৬.২)	(৯.৬)	(৮.০)	(১৩.৩)	(১৩.০)	
২০১২-১৩	১৭,৪৬৪	১৪,২৮৯	২৯,৮৩৩	১১৪০৫	৯,৯৭৪	১২,৩৬৮	১৯,৬৯০	১২,৯৬৮	২৩,৯৯৭	২২,২০৭	১,৭৪,২১৫
	(১০.০)	(৮.২)	(১৭.১)	(৬.৫)	(৫.৭)	(৭.১)	(১১.৩)	(৭.৫)	(১৩.৮)	(১২.৭)	
২০১৩-১৪	৪২,৬৫২	১৪,৮০১	৩৫,৫৬৩	১৪১৪৬	১১,৩৫১	২০,৫৯৬	১৭,৪৭১	১৪,৪৫৮	২৭,৭৪৩	২৩,৭৩৩	২,২২,৪৯৪
	(১৯.২)	(৬.৭)	(১৬.০)	(৬.৪)	(৫.১)	(৯.৩)	(৭.৯)	(৬.৫)	(১২.৫)	(১০.৭)	

() মোট ব্যয়ের শতকরা হার/উৎস: আইবাস, অর্থ বিভাগ

পরিশিষ্ট-২

খাততিত্তিক উন্নয়ন ব্যয়

(কোটি টাকা)

অর্থ বছর	জনসেবা ও জন শৃংখলা	স্থানীয় সরকার	শিক্ষা, প্রযুক্তি ও স্বাস্থ্য	সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যান	জ্বালানী ও বিদ্যুৎ	পরিবহন ও যোগাযোগ	কৃষি	অন্যান্য	মোট
২০০১-০২	২৬৪	২,৮৮০	৩,২৭৩	৭৯৭	১,৯২৪	৩,৯৫১	১,৬৭৭	৩০৩	১৫,০৬৯
	(১.৮)	(১৯.১)	(২১.৭)	(৫.৩)	(১২.৮)	(২৬.২)	(১১.১)	(২.০)	
২০০২-০৩	৩৫৫	২,৭৬৬	৩,৪৮৪	৬৮৯	২,৭৪৮	৪,২৫৭	১,৪২১	৩৫৬	১৬,০৭৬
	(২.২)	(১৭.২)	(২১.৭)	(৪.৩)	(১৭.১)	(২৬.৫)	(৮.৮)	(২.২)	
২০০৩-০৪	৫০৫	৩,৭৩৯	২,৯০৫	৭৩৩	৩,৭৫০	৩,১৭১	১,৩৬০	৭০৫	১৬,৮৬৮
	(৩.০)	(২২.২)	(১৭.২)	(৪.৩)	(২২.২)	(১৮.৮)	(৮.১)	(৪.২)	
২০০৪-০৫	৫৫২	৪,৪৩৪	২,২৩৫	৭৬৬	৩,৯০৩	৪,২৩১	১,৫৪৩	৮২২	১৮,৪৮৬
	(৩.০)	(২৪.০)	(১২.১)	(৪.১)	(২১.১)	(২২.৯)	(৮.৩)	(৪.৪)	
২০০৫-০৬	৬৭০	৪,১৫৩	৩,৩৯৫	৬৮৩	৩,৭৯১	২,৮১২	১,৬৩৭	৬৮৮	১৭,৮২৯
	(৩.৮)	(২৩.৩)	(১৯.০)	(৩.৮)	(২১.৩)	(১৫.৮)	(৯.২)	(৩.৯)	
২০০৬-০৭	৭১৫	৫,১৮১	৪,২১৪	৪৫২	২,৮৬২	২,৮২০	১,৪৫৫	৫৮৪	১৮,২৮৩
	(৩.৯)	(২৮.৩)	(২৩.০)	(২.৫)	(১৫.৭)	(১৫.৪)	(৮.০)	(৩.২)	
২০০৭-০৮	১,০৩৬	৪,৮১৬	৪,৭০৭	৯২২	২,৮৩০	২,২৪৩	১,৮২৭	৬৬৯	১৯,০৫০
	(৫.৪)	(২৫.৩)	(২৪.৭)	(৪.৮)	(১৪.৯)	(১১.৮)	(৯.৬)	(৩.৫)	
২০০৮-০৯	৮৯২	৫,৪১৪	৫,০২৩	২,৩৪১	২,৫২০	১৯০৩	১,৮১৯	৮২১	২০,৭৩৩
	(৪.৩)	(২৬.১)	(২৪.২)	(১১.৩)	(১২.২)	(৯.২)	(৮.৮)	(৪.০)	
২০০৯-১০	৯৭৯	৬,৮৭৯	৬,৬৩৭	১,৯৩৫	৩,৩৫৮	৩,২৮৭	২,৪২১	৯৮৪	২৬,৪৮০
	(৩.৭)	(২৬.০)	(২৫.১)	(৭.৩)	(১২.৭)	(১২.৪)	(৯.১)	(৩.৭)	
২০১০-১১	১,৫৩৪	৮,২৮৯	৭,৪২৩	১,৭৮৮	৭,০১৫	৩,৮০৯	২,৯১০	১,২৩৪	৩৪,০০২
	(৪.৫)	(২৪.৪)	(২১.৮)	(৫.৩)	(২০.৬)	(১১.২)	(৮.৬)	(৩.৬)	
২০১১-১২	১,৩৫৪	৯,১১৩	৭,০০১	২,৪০৫	৭,৯২৭	৫,৯৫০	৩,১৯৬	১,৭২৬	৩৮,৬৭২
	(৩.৫)	(২৩.৬)	(১৮.১)	(৬.২)	(২০.৫)	(১৫.৪)	(৮.৩)	(৪.৫)	
২০১২-১৩	১,৬১১	১১,৯০২	৯,৪৯০	৩,০৫৯	৯,৮২৯	৮,৩৪৩	৩,৫২৩	২,৫৯৬	৫০,৩৫৩
	(৩.২)	(২৩.৬)	(১৮.৮)	(৬.১)	(১৯.৫)	(১৬.৬)	(৭.০)	(৫.২)	
২০১৩-১৪ বাজেট	৩,০৩৯	১২,৫১৬	১২,৬৭৩	৪,০৩৯	১১,৩০৮	১৬,০৬০	৪,২১৭	৩,৪৭৬	৬৭,৩২৮
	(৪.৫)	(১৮.৬)	(১৮.৮)	(৬.০)	(১৬.৮)	(২৩.৯)	(৬.৩)	(৫.২)	

উৎস: আইবাস, অর্থ বিভাগ; ()মোট ব্যয়ের শতকরা হার

পরিশিষ্ট- ৩

বাজেট ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাস

(কোটি টাকা)

অর্থ বছর	বেতন ও ভাতা	দ্রব্য সামগ্রী এবং সেবা	সুদ পরিশোধ	ভর্তুকি ও স্থানান্তর	অন্যান্য ব্যয়	রাজস্ব খাতের মূলধন ও এডিপি ব্যয়	মোট বাজেট
২০০১-০২	৬,৭৩৪	৩,২৮০	৪,৯৪৯	৫,৭৫২	১,০৭১	১৬,৩৮৬	৩৮,১৭২
	(১৭.৬)	(৮.৬)	(১৩.০)	(১৫.১)	(২.৮)	(৪২.৯)	
২০০২-০৩	৭,১২১	৪,০৫২	৫,৬৬৯	৭,০৬৬	৪০৯	১৬,৫৪৮	৪০,৮৬৫
	(১৭.৪)	(৯.৯)	(১৩.৯)	(১৭.৩)	(১.০)	(৪০.৫)	
২০০৩-০৪	৭,৬৬০	৪,৫৬৩	৫,৭৬৯	৭,৮৯৪	১৮৫	১৯,২৩৩	৪৫,৩০৪
	(১৬.৯)	(১০.১)	(১২.৭)	(১৭.৪)	(০.৪)	(৪২.৫)	
২০০৪-০৫	৮,৪৫৮	৫,৬৩৪	৬,৮৪২	১০,০৩৫	৩১০	২০,৩৯০	৫১,৬৬৯
	(১৬.৪)	(১০.৯)	(১৩.২)	১৯.৪	(০.৬)	(৩৯.৫)	
২০০৫-০৬	৯,৯৩৭	৫,৩৭৭	৭,৮৯৪	১০,৫৫৭	৪৮৩	২১,৩৫৬	৫৫,৬০৪
	(১৭.৯)	(৯.৭)	(১৪.২)	১৯.০	(০.৯)	(৩৮.৪)	
২০০৬-০৭	১২,৩৩১	৫,৮৯০	১০,৫০৮	১৪,০১৫	৩৬৬	২০,৯৪০	৬৪,০৫০
	(১৯.৩)	(৯.২)	(১৬.৪)	(২১.৯)	(০.৬)	(৩২.৭)	
২০০৭-০৮	১২,৭১৭	৭,৩২৪	১৩,৭৩৮	১৮,৯২৯	২৮৮	৩৭,৬৮২	৯০,৬৭৮
	(১৪.০)	(৮.১)	(১৫.২)	(২০.৯)	(০.৩)	(৪১.৬)	
২০০৮-০৯	১৩,৮৬৪	৮,২২৬	১৫,৩৫৮	২৪,৬৪৮	১৮৪	২৭,০৩৫	৮৯,৩১৫
	(১৫.৫)	(৯.২)	(১৭.২)	(২৭.৬)	(০.২)	(৩০.৩)	
২০০৯-১০	১৩,০৫০	৮,৮৪৯	১৪,৮৬৮	২৬,২৬৫	২৭৯	৩৪,৫০৬	১০,১৫১৭
	(১৫.৮)	(৮.৭)	(১৪.৬)	(২৬.৬)	(০.৩)	(৩৪.০)	
২০১০-১১	১৯,৯১৮	১০,১৬১	১৫,৬৩৭	৩১,৪৮৯	২৮১	৫০,৭৯৭	১,২৮,২৮৩
	(১৫.৫)	(৭.৯)	(১২.২)	(২৪.৫)	(০.২)	(৩৯.৬)	
২০১১-১২	২১,০৬৫	১১,০৮১	২০,৩৫১	৩৬,৬৩৪	১৬৬	৬৩,১৫০	১,৫২,৪৪৭
	(১৩.৮)	(৭.৩)	(১৩.৩)	(২৪.০)	(০.১)	(৪১.৪)	
২০১২-১৩	২১,৭২৫	১৩,০৮৬	২৩,৯৯৭	৪০,৬৫৫	২৩৬	৭৪,৫১৬	১,৭৪,২১৫
	(১২.৫)	(৭.৫)	(১৩.৮)	(২৩.৩)	(০.১)	(৪২.৮)	
২০১৩-১৪ বাজেট	২৪,৮৬৭	১৫,৮২৮	২৭,৭৪৩	৪৩,১৪৫	১,৮৮৭	১,০৯,০২১	২,২২,৪৯১
	(১১.২)	(৭.১)	(১২.৫)	(১৯.৪)	(০.৮)	(৪৯.৩)	

উৎস: আইবাস, অর্থ বিভাগ; ( ) মোট ব্যয়ের শতকরা হার

পরিশিষ্ট-৪

ভর্তুকি ও সাহায্য মঞ্জুরি বাবদ ব্যয়

(কোটি টাকা)

অর্থ বছর	ভর্তুকি এবং নগদ ঋণ	বাজেটের অংশ	মোট সাহায্য মঞ্জুরি	বাজেটের অংশ	সাহায্য মঞ্জুরি খাতের বিভাজন (মোট সাহায্য মঞ্জু ব্যয়ের অংশ)						
					সাধারণ মঞ্জুরি	বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন	ডিজিটি	ডিজিএফ	টি আর	জি আর	অন্যান্য
২০০২	৬৭৭	১.৭৭	৩,৪১৫.৯	৮.৯৪	৫.৪	৪৬.০	০.০	৩.৭	১০.১	০.৯	৩৩.৯
২০০৩	১,৩৫০	৩.৩০	৩,৯২৪.৫	৯.৫৯	৪.৭	৪২.১	৬.১	২.৮	৬.৬	১.৩	৩৬.৪
২০০৪	১,১৯১	২.৬২	৪,৯৮৪.৫	১০.৯৯	৪.৬	৩৭.৩	৪.৭	২.৯	৫.৩	১.২	৪৩.৯
২০০৫	১,৯৭০	৩.৮১	৬,৪৩৪.৭	১২.৪৩	৩.৫	৩৪.০	৪.৫	৫.১	৪.৮	২.১	৪৬.১
২০০৬	২,৫৭১	৪.৬২	৬,৪১৯.১	১১.৫৪	৪.১	৪৩.৮	৪.৯	০.০	১.৯	০.০	৪৫.২
২০০৭	১১,৫৮০	১৮.০৫	৭,৬৬৮.৭	১১.৯৫	৩.৭	৩৯.২	২.৪	৫.২	৫.১	০.৭	৪৩.৬
২০০৮	১০,২৯৪	১১.৩৩	৯,২৭০.৩	১০.২১	৩.৬	৩৫.৮	৫.৯	৫.৭	৪.৪	১.৩	৪৩.৪
২০০৯	৯,৮২০	১০.৯৯	১,৩৫২৫.৭	১৫.১৪	২.৩	২২.৪	৫.৬	১১.১	৯.২	১.৪	৪৮.০
২০১০	৯,৩১৭	৯.১৮	১৫,০১৯.২	১৪.৭৯	২০.৫	৩০.৫	৪.১	৪.৩	৬.৭	০.৭	৩৩.১
২০১১	১৭,১৪১	১৩.৩৬	১৬,৫৮৫.৩	১২.৯৩	৩০.১	৩০.১	৪.০	২.৩	৩.৯	০.৮	২৮.৯
২০১২	২৮,৮১৪	১৮.৯০	১৮,৬৫৬.৫	১২.২৪	৩২.৪	২৬.৯	৪.১	২.৯	৬.৯	০.৯	২৫.৯
২০১৩	৩৫,০৪৬	২০.১১	১৯,২৯৯.৭	১১.০৮	৩০.৪	২৭.৪	৪.৯	৪.৪	৭.৮	০.৯	২৪.৯
২০১৪ বাজেট	৩২,৩৫৪	১৪.৫৪	২০,৮৯২.৩	৯.৩৯	২৭.৩	২৭.৩	৪.১	৬.৪	৭.৩	১.৩	২৬.৪

উৎস: বাজেট ১, অর্থ বিভাগ

পরিশিষ্ট- ৫

ব্যয়ভিত্তিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির কাঠামো: খাতভিত্তিক অবদান (%)

অর্থ বছর	ভোগ ব্যয়	বিনিয়োগ ব্যয়	সরকারি ব্যয়	অভ্যন্তরীন চাহিদা	নীট রপ্তানি	প্রবৃদ্ধি
	১	২	৩	৪=১+২+৩	৫	৬=৪+৫
২০০১-০২	০.৯৪	১.৮৮	-০.১৪	২.৬৮	১.৭৪	৪.৪২
২০০২-০৩	২.৭৯	১.৯১	০.৭৬	৫.৪৬	-০.২০	৫.২৬
২০০৩-০৪	৩.০০	১.৬৬	১.৫৩	৬.১৯	০.০৮	৬.২৭
২০০৪-০৫	৪.২৪	২.৫৪	০.৯২	৭.৭১	-১.৭৫	৫.৯৬
২০০৫-০৬	২.১৪	২.১৮	০.৬১	৪.৯৩	১.৭০	৬.৬৩
২০০৬-০৭	৪.৪০	২.৬১	০.২২	৭.২৪	-০.৮১	৬.৪৩
২০০৭-০৮	৩.৬১	০.৬৯	-০.০২	৪.২৭	১.৯২	৬.১৯
২০০৮-০৯	৩.৪৪	১.৪৭	০.২৮	৫.১৯	০.৫৫	৫.৭৪
২০০৯-১০	৩.৩৭	১.৩৫	১.২৯	৬.০২	০.০৫	৬.০৭
২০১০-১১	৩.৬২	১.৪৩	১.৫১	৬.৫৬	০.১৫	৬.৭১
২০১১-১২	২.৭৯	১.৬৫	১.৬৯	৬.১২	০.১১	৬.২৩
২০১২-০৩ (সাময়িক)	৩.৪৮	-০.২২	২.২৬	৫.৫২	০.৫১	৬.০৩

উৎস: বিবিএস এর তথ্যাবলম্বনে অর্থ বিভাগে প্রস্তুতকৃত

পরিশিষ্ট- ৬

বৈদেশিক সাহায্যের অঙ্গীকার ও ডিসবার্সমেন্ট (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থ বছর	প্রারম্ভিক পাইপ লাইন	কমিটমেন্ট			ডিসবার্সমেন্ট		
		অনুদান	ঋণ	মোট	অনুদান	ঋণ	মোট
২০০১-০২	৮,৫৫৭.৯৬	৪০১.৭৭	৪৭৬.৯৮	৮৭৮.৭৪	৪৭৮.৮১	৯৬৩.২৩	১,৪৪২.২৩
২০০২-০৩	৫,৪৫০.০৪	৩৮৩.৩০	১৩০৯.২৭	১৬৯২.৫৭	৫১০.১৪	১০৭৪.৮৮	১,৫৮৫.০২
২০০৩-০৪	৫,৭৩৮.১১	৮৮৬.৭৮	১০৩৬.৩০	১৯২৩.০৮	৩৩৮.৪৫	৬৯৪.৯৮	১,০৩৩.৪৩
২০০৪-০৫	৬,৯১১.০৬	৩০২.৯২	১২৭৭.৮০	১৫৮০.৭১	২৪৪.২৩	১২৪৪.২২	১,৪৮৮.৪৫
২০০৫-০৬	৬,৬৯৪.৫৪	৬২৮.৩৯	১১৫৮.৯৮	১৭৮৭.৩৬	৫০০.৫৪	১০৬৭.০৯	১,৫৬৭.৬৪
২০০৬-০৭	৬,৭৫৯.৫৮	৭২৮.৫০	১৫২৭.৬৪	২২৫৬.১২	৫৯০.১৭	১০৪০.৪০	১,৬৩০.৫৮
২০০৭-০৮	৭,২৮৮.৩৪	৯৬১.৮৯	১৮৮০.৫৬	২৮৪২.৪৪	৬৫৮.১২	১৪০৩.৪০	২,০৬১.৫১
২০০৮-০৯	৮,৬৮২.১৪	৪৩২.২৬	২০২১.০৬	২৪৪৪.৩২	৬৫৭.৮১	১১৮৯.৫০	১,৮৪০.৩১
২০০৯-১০	৮,৮৬১.২৮	৫৫৫.১৫	২৪২৮.৫৩	২৯৮৩.৬৮	৬৩৯.১৭	১৫৮৮.৬০	২,২২৭.৭৭
২০১০-১১	৯,৪২৯.৩৭	৬৩০.৪৭	৫৩৩৮.১৭	৫৯৬৮.২৩	৭৪৫.১০	১০৩১.৬৪	১,৭৭৬.৭৪
২০১১-১২	১৪,১৫১.৯৯	১৪৪১.৩৮	৩৩২৩.১৫	৪৭৬৪.৫৩	৫৮৭.১০	১৫৩৮.৪৮	২,১২৬.৪৮
২০১২-১৩	১৫,৪৩০.১৫	৬২৪.৮০	৫৩১০.২৭	৫৯৩৫.০৬	৭০৮.৮২	২০৬৩.২৪	২,৭৭২.০৬
২০১৩-১৪ (অক্টোবর ২০১৩ পর্যন্ত)	১,৬৫৪.০০	১৫৩.৬১	১১৭২.৫০	১৩২৬.১১	১৪৪.৩৪	৪৩২.৪৬	৫৭৬.৮০

সূত্র: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

পরিশিষ্ট- ৭

বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থ বছর	ঋণ পরিশোধ			বকেয়া
	আসল	সুদ	মোট	
২০০১-০২	৪৩৫.৩০	১৫১.০০	৫৮৬.৩০	১৫,৮৮৫.২০
২০০২-০৩	৪৫১.৯০	১৫৬.১০	৬০৮.০০	১৬,৯৫৩.১০
২০০৩-০৪	৪২৩.১০	১৬৫.৬০	৫৮৮.৭০	১৭,৯৫৩.৩০
২০০৪-০৫	৪৭২.৬০	১৮২.৭০	৬৫৫.৩০	১৮,৪১৫.৮০
২০০৫-০৬	৫০২.০০	১৭৬.১০	৬৭৮.১০	১৮,৬০২.৫০
২০০৬-০৭	৫৪০.২০	১৮১.৮০	৭২১.৯০	১৯,৩৫৪.৮০
২০০৭-০৮	৫৮৫.৭০	১৮৪.৫০	৭৭০.২০	২০,২৬৫.৮০
২০০৮-০৯	৬৫৫.৬০	১৯৯.৮০	৮৫৫.৪০	২০,৮৫৮.৮০
২০০৯-১০	৬৮৫.৭০	১৮৯.৮০	৮৭৫.৬০	২০,৩৩৫.৮০
২০১০-১১	৭২৯.২০	২০০.২০	৯২৯.৪০	২২,০৮৫.৫০
২০১১-১২	৭৬৯.৯০	১৯৬.৬০	৯৬৬.৫০	২২,০৯৫.২০
২০১২-১৩	৯১৯.১৯	২০২.১৯	১১২১.৩৮	২২,২১০.০০
২০১৩-১৪ (অক্টোবর/১৩)	২৭৫.৩২	৬৬.০২	৩৪১.৩৪	-

সূত্র: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

পরিশিষ্ট- ৮

বেসরকারি সাহায্য সংস্থার মাধ্যমে প্রাপ্ত বৈদেশিক সহায়তা (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থ বছর	এনজিও সংখ্যা		প্রকল্প সংখ্যা	অনুমোদিত অর্থের পরিমাণ	ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ
	স্থানীয়	বৈদেশিক			
২০০১-০২	১,৫০৬	১৭৩	৭৪৬	২৯৮.৬৪	২০৮.২৮
২০০২-০৩	১,৬২১	১৭৯	৭৯৪	২৭৫.৩১	২৭৯.৬৪
২০০৩-০৪	১,৭০৫	১৮৪	৯৩৯	৪৯৮.০৮	৩১৩.০৭
২০০৪-০৫	১,৮০২	১৮৬	১১৯৩	৩১৯.৩৭	২৭৪.০২
২০০৫-০৬	১,৮৭০	১৯০	৯৩০	৪৫৬.৭৯	৩৪৭.৫৩
২০০৬-০৭	১,৯৯৯	১৯৮	৯০৮	৫০৭.২৯	৩২২.৬১
২০০৭-০৮	২,১১৪	২০৬	১৪৬২	৪৪২.১৫	৫২৩.১১
২০০৮-০৯	২,১৯১	২২১	১০৪২	৪১৪.০২	৪৮৬.১৯
২০০৯-১০	২,৩০৪	২৩০	১১৭২	৬৮১.৩৮	৫১৬.০৩
২০১০-১১	১,৮৬১	২০০	১১২০	৭২৫.৫৯	৬৫৮.৯৪
২০১১-১২	১,৯৩৬	২১০	১০৭৭	৯৩৯.২৯	৫৭৯.৬৪
২০১২-১৩	২,০৩৫	২১৯	১০৪৮	৬৩৯.৮৩	৬৭৭.৫১

সূত্র: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

পরিশিষ্ট- ৯

রাজস্ব আয় (বিলিয়ন টাকা)

অর্থ বছর	কর আয়	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাভুক্ত কর রাজস্ব*					জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাবহির্ভূত কর রাজস্ব	কর ব্যতিত প্রাপ্তি	সর্ব মোট রাজস্ব আয়
		মোট	আয় ও মুনাফার উপর কর	আমদানি শুল্ক	ভ্যাট এবং পরিপূরক শুল্ক	অন্যান্য কর ও শুল্ক			
১	২=৩+৮	৩=৪+৫+৬+৭	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০=২+৯
২০০২-০৩	২৪৩ (৮.০৭)	২৩২ (৭.৭১)	৩৯	৬৮	১২৩	২	১১	৬২ (২.০৫)	৩০৪ (১০.১২)
২০০৩-০৪	২৭০ (৮.১১)	২৫৮ (৭.৭৪)	৪৪	৭৩	১৩৮	৩	১২	৬৫ (১.৯৫)	৩৩৫ (১০.০৭)
২০০৪-০৫	৩০৫ (৮.২২)	২৯১ (৭.৮৪)	৫১	৭৮	১৫৮	৩	১৪	৬৯ (১.৮৬)	৩৭৪ (১০.০৮)
২০০৫-০৬	৩৪০ (৮.১৭)	৩২৪ (৭.৮০)	৬৪	৭৮	১৭৯	৩	১৫	৮৬ (২.০৭)	৪২৬ (১০.২৪)
২০০৬-০৭	৩৮০ (৮.০৫)	৩৬২ (৭.৬৬)	৮৬	৭৬	১৯৩	৬	১৯	১০৫ (২.২২)	৪৮৫ (১০.২৭)
২০০৭-০৮	৪৮১ (৮.৮২)	৪৫৮ (৮.৩৯)	১১৭	৮৮	২৪৭	৭	২৩	১১৩ (২.০৮)	৫৯৫ (১০.৯০)
২০০৮-০৯	৫২৯ (৮.৬০)	৫০২ (৮.১৭)	১৩৪	৮৪	২৭৭	৭	২৭	১১৭ (১.৯০)	৬৪৬ (১০.৫০)
২০০৯-১০	৬২৫ (৯.০০)	৫৯৭ (৮.৬০)	১৬২	৮৯	৩৩৯	৮	২৭	১৩৪ (১.৯৩)	৭৫৯ (১০.৯৩)
২০১০-১১	৭৯৫ (৯.৯৮)	৭৬২ (৯.৫৭)	২২০	১০৮	৪২৬	৯	৩৩	১৩৪ (১.৬৯)	৯৩০ (১১.৬৭)
২০১১-১২	৯৫২ (১০.৩৭)	৯১৬ (৯.৯৮)	২৮২	১২০	৫০৩	১২	৩৬	১৯৫ (২.১২)	১১৪৭ (১২.৪৯)
২০১২-১৩	১০৭৫ (১০.৩৫)	১০৩৩ (৯.৯৬)	৩৪৪	১২৬	৫৫০	১৩	৪১	২১৪ (২.০৬)	১২৮৮ (১২.৪১)
২০১৩-১৪	১৪১২ (১১.৮৮)	১৩৬১ (১১.৪৫)	৪৮৩	১৪৬	৭০৮	২৪	৫১	২৬২ (২.২১)	১৬৭৫ (১৪.০৯)

() বিডিপির শতকরা হার, উৎস: অর্থ বিভাগ;* অর্থ বিভাগের আইবাস তথ্য ভান্ডার রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত প্রকৃত হিসাব প্রদর্শন করে বিধায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তথ্যের সাথে সামান্য ভারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

পরিশিষ্ট- ১০

জাতীয় সঞ্চয় স্কীমের বিনিয়োগ বিবরণী

অর্থবছর	মোটবিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা	মোটঅর্জিত বিনিয়োগ	মূল পরিশোধ	সুদ পরিশোধ	নীটঅর্জিত জমা	শতাংশিক (%) অর্জন
২০০২-০৩	৮,৬০৮.০০	৯,৪১৮.৬৩	৫,১১২.৬১	২,৫৬৮.৮০	৪,৩০৬.০২	১০৯%
২০০৩-০৪	৮,৮১৮.০০	৯,৬৭৮.২০	৫,৭৭২.৬২	৩,০৭০.৭০	৩,৯০৫.৫৮	১১০%
২০০৪-০৫	১০,৪৪২.০০	১০,১৮০.৫৭	৭,৬৮৪.৫০	৩,৭২৫.৯৬	২,৪৯৬.০৭	৯৭%
২০০৫-০৬	১১,৫৪৫.০০	১৩,৭৯৯.৮৩	১০,৮৩৩.২৫	৪,৩৫২.৪০	২,৯৬৬.৫৮	১২০%
২০০৬-০৭	১৩,২৩৯.৮০	১৫,১২৩.৫৩	১০,৯৪৮.৬১	৪,৯২৪.৪৭	৪,১৭৪.৯২	১১৪%
২০০৭-০৮	১২,৩৫৭.৫৫	১৪,১০৫.৭৯	১১,৫৮৭.৫০	৫,৬৩১.৪৯	২,৫১৮.২৯	১১৪%
২০০৮-০৯	১৫,০৫৫.৯৪	১৬,০৩৫.২৮	১২,৩৫২.২৯	৭,১২৬.৪৭	৩,৬৮২.৭৯	১০৭%
২০০৯-১০	২২,৬৩৮.০০	২৫,৫৫৩.৬৯	১৩,৯৬৩.০৫	৬,৮২৫.০০	১১,৫৯০.৬৪	১১৩%
২০১০-১১	২০,২৭৫.০০	১৭,২৩২.০৩	১৫,১৭৫.০৯	৬,৩০৭.৫৩	২,০৫৬.৯৪	৮৫%
২০১১-১২	১৮,৩৭৯.৫০	১৮,৯৫৫.৩৫	১৮,৪৭৬.৩৩	৭,০১৯.৮৭	৪৭৯.০২	১০৩%
২০১২-১৩	২৪,৩২৮.৬৪	২৩,৩২৬.৭৭	২২,৫৫৩.৯৩	৭,৯৮০.৬৪	৭৭২.৮৪	৯৬%
২০১৩-০৪*	২০,০০০.০০	৭,৪৩৩.৯১	৪,৭৩৫.০৩	২,৪৩০.৫৭	২,৬৯৮.৮৮	৩৭%

উৎস: জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর; *জুলাই-অক্টোবর, ২০১৩পর্যন্ত

রপ্তানি ও আমদানির বিবরণী

অর্থবছর	রপ্তানি			আমদানি		
	বিলিয়নমার্কিনডলার	প্রবৃদ্ধি(%)	জিডিপি'র শতকরা হার	বিলিয়নমার্কিনডলার	প্রবৃদ্ধি(%)	জিডিপি'র শতকরা হার
২০০১-০২	৫.৯৮	-৭.৪৩	১২.৫৭	৮.৫৪	-৮.৪৭	১৭.৯৫
২০০২-০৩	৬.৫৪	৯.৩৬	১২.৬০	৯.৬৫	১৩.০০	১৮.৫৯
২০০৩-০৪	৭.৬	১৬.২১	১৩.৪৫	১০.৯	১২.৯৫	১৯.২৯
২০০৪-০৫	৮.৬৫	১৩.৮২	১৪.৩২	১৩.১৪	২০.৫৫	২১.৭৬
২০০৫-০৬	১০.৫২	২১.৬২	১৬.৯৭	১৪.৭৪	১২.১৮	২৩.৭৮
২০০৬-০৭	১২.১৭	১৫.৬৮	১৭.৭৮	১৭.১৫	১৬.৩৫	২৫.০৬
২০০৭-০৮	১৪.১১	১৫.৯৪	১৭.৭৩	২১.৬২	২৬.০৬	২৭.১৭
২০০৮-০৯	১৫.৫৬	১০.২৮	১৭.৪১	২২.৫	৪.০৭	২৫.১৮
২০০৯-১০	১৬.২	৪.১১	১৬.১৪	২৩.৭৩	৫.৪৭	২৩.৬৪
২০১০-১১	২২.৯২	৪১.৪৮	২০.৪৭	৩৩.৬৫	৪১.৮০	৩০.০৬
২০১১-১২	২৪.২৮	৫.৯৩	২০.৯২	৩৫.৫১	৫.৫৩	৩০.৫৯
২০১২-১৩	২৭.০৩	১১.৩৩	২০.৮১	৩৪.০৮	-৪.০৩	২৬.২৪

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

বাপ্রসঃমুঃ-২০১৩/২০১৪-৪৬৫৩কম/এ-১,০০০ বই, ২০১৩।

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.mof.gov.bd